গৌরীপুর জংশন

হুমায়ূন আহমেদ

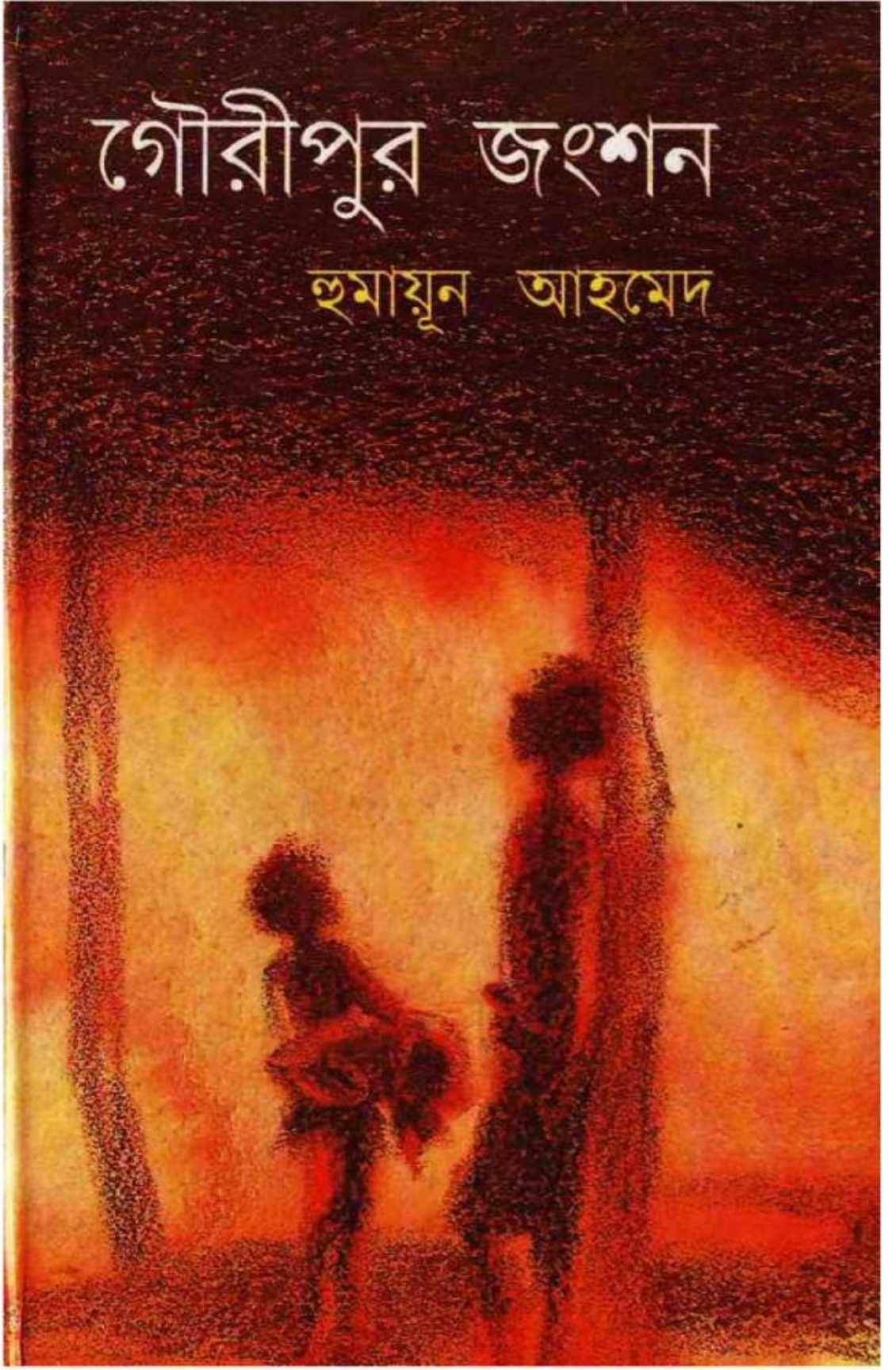

আমি আমার গ্রন্থের নামকরণে অনেকবার কবিদের কাছে হাত পেতেছি। এবার হাত পাতবার আগেই নাম পেয়ে গেলাম। কবি নির্মলেন্দু গুণ পাণ্ডুলিপি পড়ে নাম দিলেন – গৌরীপুর জংশন। তাঁকে ধন্যবাদ।

হুমায়ূন আহমেদ

৭–৫–৯০

শহীদুল্লাহ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মনে হচ্ছে কানের কাছে কেউ শিস দিচ্ছে।

শিসের শব্দে জয়নালের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সে মনে মনে বলল, "বিষয় কি? কোন হালার পুত....."। মনে মনে বলা কথাও সে শেষ করল না। মনের কথা দীর্ঘ হলে ঘুম চটে যেতে পারে। ইদানিং তার কি যেন হয়েছে। একবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর ঘুম আসে না।

জয়নাল তার হাথ পা আরো গুটিয়ে নিল। তবুও শীত যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে শুয়ে আছে বড় একটা বরফের চ্যাঙের উপর। অতচ সে শুয়ে আছে কাপরের একটা বস্তার উপর। কম্বলটাও দু'ভাজ করে গায়ের উপর দেয়া। মাথা কম্বলে ঢাকা কাজেই যে উষ্ণ নিঃশ্বাস সে ফেলছে সেই উষ্ণ নিঃশ্বাসও কম্বলের ভিতরেই আটকা পড়ে থাকার কথা। তবু এত শীত লাগছে কেন? শীতের চেয়েও বিরক্তিকর হচ্ছে কানের কাছে শিসের শব্দ। বিষয়টা কি? কম্বল থেকে মাথা বের করে একবার কি দেখবে? কাজটা কি ঠিক হবে? কম্বলের ভিতর থেকে মাথা বের করার অর্থই হচ্ছে এক ঝলক বরফ শীতল হাওয়া কম্বলের ভিতর ঢুকিয়ে নেয়া। এ ছাড়াও বিপদ আছে, মাথা বের করলেই এমন কিছু হয়তো সে দেখবে যাতে মনটা খারাপ হবে। বজলু নামের আট ন' বছরের ছেলে ক'দিন ধরেই ইষ্টিশনে ঘুর ঘুর করছে। শীতের কোনো কাপর, এমন কি একটা সুতির চাদর পর্যন্ত নেই। সন্ধার পর থেকে ঐ ছেলে শীতের কাপড় আছে এমন সব মানুষের সঙ্গে ঘুর ঘুর করে। দেখে অবশ্যই মায়া লাগে। কিন্তু মায়াতে তো আর সংসার চলে না। মায়ার উপর সংসার চললে তো কাজই হত। এই যে সে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে এই কম্বলও যে কেউ ফস করে টান দিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এখনও যে নেয়নি এটাই আল্লাহর অসীম দয়া।

আবার শিস দেয়ার শব্দ হচ্ছে। বিষয়টা কি? নিতান্ত অনিচ্ছায় জয়নাল কম্বলের ভেতর থেকে মাথা বের করল। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ল না। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে। ষ্টেশনের আলো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মালঘরে রাখা প্রতিটি কাপড়ের বস্তার উপর একজন দু'জন করে শুয়ে আছে। এই বস্তাগুলি থাকায় রক্ষা হয়েছে। মেঝেতে ঘুমুতে হলে সর্বনাশ হয়ে যেত।

জয়নাল চারদিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখতে লাগল। যা ভেবেছিল তাই— বজলু পায়ের কাছে কুন্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে চটের একটা বস্তা। শীতের সময় চটের বস্তাটা খারাপ না। ভেতরে ঢোকে মুখ বন্ধ করে দিলে বেশ ওম হয়। অল্প বয়স্কদের এর চে ভাল শীত বস্ত্র আর কিছুই হয় না। বড় মানুষের জন্যে অসুবিধা। বস্তার ভেতরে পুরো শরীর ঢোকে না।

শিসের রহস্য এখন বের হল। ঐ হারামজাদা বজলু শিসের মত শব্দ করছে। কোন অসুখ বিসুখ না-কি? জয়নাল কড়া গলায় ডাকল, এ্যাই এ্যাই। প্রচন্ড শীতে ঘুম কখনো গাঢ় হয় না। বজলু সঙ্গে সঙ্গে বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করে বলল, জ্বি।

লাথি দিয়া মুখ ভোতা কইরা ফেলবাম। হারামজাদা শব্দ করস ক্যান?

বজলু কিছুই বুঝতে পারছে না। চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে।

শব্দ হয় ক্যান?

কি শব্দ?

সত্যি সত্যি কি একটা লাথি বসাবে? বসানো উচিত। এই হারামজাদা সারাক্ষণ তার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে। এইভাবে ঘুর ঘুর করলে এক সময় মায়া পড়ে যায়। গরীব মানুষের জন্যে মায়া খুব খারাপ জিনিষ। জয়নাল খ্যাঁকিয়ে উঠল, এই হারামজাদা নাম।

জ্বি।

কথায় কথায় ভদ্রলোকের মত বলে জ্বি। টান দিয়া কান ছিইড়্যা ফেলমু। ছোড লোকের বাচ্চা। তুই নাম।

বিস্মিত বজলু উঠে বসল।

নাম। তুই নাম কইলাম।

বজলু চটের ভেতর থেকে বের হয়ে এল। জয়নাল দেখল সে সত্যি সত্যি নেমে যাচ্ছে। তার মন খানিকটা খারাপ হল। এতটা কঠিন না হলেও হত। তবে এর একটা ভাল দিক আছে। এই ব্যাটা এর পর আর তার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর

করবে না। সে যখন ফেরদৌসের দোকানে পরোটা ভাজি খাবে তখন একটু দূরে বসে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকবে না। হারামজাদা একেবারে কুকুরের স্বভাব পেয়েছে। জয়নাল কম্বলে পুরো মুখ ঢেকে ফেলল। বজলু এখন কোথায় যাবে, কোথায় ঘুমুবে এই নিয়ে তার মোটেই মাথা ব্যথা নেই। যেখানে ইচ্ছা যাক। শিসের শব্দ কানে না এলেই হল। জয়নালের মন একটু অবশ্যি খচ খচ করছে। সে মনের খচ খচানিকে তেমন গুরত্ব দিল না। ভেঙ্গে যাওয়া ঘুম জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে লাগল। পৌষমাস শেষ হতে চলল এখনো এত শীত কেন কে জানে। মনে হয় দুনিয়া উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। কেয়ামত যখন নজদিক তখন এই রকম উলট পালট হয়। কেয়ামত যখন খুব কাছাকাছি চলে আসবে তখন হয়ত চৈত্র মাসেও শীতে হু হু করে কাঁপতে হবে।

জয়নালের ঘুম আসছে না। বজলুকে ধমক দিয়ে সরিয়ে দেয়াটা ঠিক হয় নি। মনের খচখচানি যাচ্ছে না। শোবার মত কোন জায়গা পেল কি না কে জানে। ছোট খাট মানুষ বেশী জায়গার তো দরকার নেই। দু'হাত জায়গা হলেই হয়। এই দু'হাত জায়গাই বা কে কাকে দেয়। এই দুনিয়া খুবই কঠিন। দুই সুতা জায়গাও কেউ কাউকে ছাড়ে না। মায়া মুহব্বত বলেও কিছু নেই। অবশ্যি মায়া মুহব্বত না থাকারও কারণ আছে। কেয়ামত এসে যাচ্ছে কেয়ামত যত নজদিক হয় মায়া মুহব্বত ততই দূরে চলে যায়। আল্লাহ পাক মায়া মুহব্বত উঠিয়ে নেন। দোষের ভাগি হয় মানুষ। অথচ বেচারা মানুষের কোন দোষই নেই।

বজলুর আপন চাচা যে বজলুকে গৌরীপুর ইষ্টিশনে ছেড়ে চলে গেল তার জন্যে ঐ চাচাকে দোষী মনে করার কোন কারণ নেই। সেই বেচারার ত নিশ্চয়ই সংসার চলছিল না। কি করবে? ভাতিজাকে ষ্টেশনে ফেলে চলে গেছে। তাও তো লোকটার বুদ্ধি আছে ইষ্টিশনে ফেলে গেছে।

ইষ্টিশন হচ্ছে পাবলিকের জায়গা। গভর্মেন্টের জায়গা। এই জায়গার উপর সবার দাবি আছে। তাছাড়া ইষ্টিশনে কেউ না খেয়ে থাকে না। কিছু না কিছু জোটেই যায়। আর একটু বড় হলে মাল বওয়া শুরু করতে পারবে। একটা স্যুটকেস নামালে দু'টাকা। ওভারব্রীজ পার হলে পাঁচ টাকা। তেমন ভদ্রলোক হলে বাড়তি বখশীশ। অবশ্যি ভদ্রলোকও এখন তেমন নেই। সামান্য একটা দুটা টাকার জন্যে যে ভাবে কথা চালাচালি করে যে এক এক সময় জয়নালের ইচ্ছা করে একটা চড় বসাতে। একদিন একটা চড় বসিয়ে দেখলে হয়। চড় খেলে কি করবে? কিছুক্ষণ নিশ্চয়ই কথা বলতে পারবে না। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

তারপর? তারপর কি করবে? দেখতে ইচ্ছা করে। ভদ্রলোকরা বিপদে পড়লে মজাদার কাণ্ড কারখানা করে।

তার যখন বোঝা টানার ক্ষমতা ছিল তখন মজা দেখার জন্যেই ভদ্রলোকদের মাঝে মধ্যে বিপদে ফেলে দিত। একবার এক ভদ্রলোকের বিছানা বালিস ট্রাঙ্ক সে ওভারব্রীজ পার করে দিল। দুই মণের মত বোঝা। ভদ্রলোকের হাতে একটা হ্যাণ্ড ব্যাগ ঐটাও তিনি নিতে পারছেন না। বললেন, ঐ কুলী এই ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নে। পারবি না?

কি কথার ঢং। কুলী বলেই তুত তুই করে বলতে হবে? আর এই পলকা ব্যাগ এইটাও হাতে নেয়া যাবে না। জায়নাল উদাস ভঙ্গিতে বলল, দেন।

পারবি তো? দেখিস ফেলে দিস না। ট্রাংকে কাচের জিনিস আছে। সামালকে যাবি।

আপনে নিজেও সামালকে সিঁড়ি দিয়া উঠবেন। বিষ্টি হইছে। সিঁড়ি পিছল।

আরে ব্যাটা তুই দেখি রসিক আছিস।

দেখা গেল ভদ্রলোক নিজেও বেশ রসিক। মালামাল পার করবার পর গম্ভীর গলায় বললেন, নে তিন টাকা দিলাম। মালের জন্যে দুই টাকা। একটাকা বখশীশ।

জয়নালের মাথায় চট করে রক্ত উঠে গেল। এই ছোটলোক বলে কি? সে অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, টাকা দেওনের দরকার নাই। আপনের জন্য ফিরি।

কি বললি? টাকা দিতে হইব না?

মজা করবার জন্যেই জয়নাল উদাস গলায় বলল, টেকা পয়সা দিয়া কি হইব কন। টেকা পয়সা হইল হাতের ময়লা।

ভদ্রলোক রেগে আগুন হয়ে বললেন, তিন টাকা তোর কাছে কম মনে হচ্ছে? সেইটা তুই বল।

ছিঃ ছিঃ কম মনে হইব ক্যান। তিন টেকা অনেক টেকা। তিন টেকায় দুই সের লবণ হয়। দুই সের লবণে একটা মাইনষের এক বছর যায়। কম কি দেখলেন? আচ্ছা তাইলে যাই।

বলেই জয়নাল আর দাঁড়াল না, বেশ গম্ভীর চালে ওভারব্রীজের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। প্রথম কিছুক্ষণ ভদ্রলোক কথা বললেন না তারপর ব্যাকুল হয়ে ডাকতে শুরু করলেন, এই শুনে যাও। এই ছেলে এই শুনে যাও।

জয়নালের আনন্দের সীমা রইল না। তুই থেকে তুমিতে উঠেছে। এটা মন্দ কি। যে শুরুতে তাকে তুই তুই করছিল সেই লোক তুমি তুমি করছে এরচে বড়

বিজয় তার মত লোক আর কি আশা করতে পারে? জয়নাল ফিরেও তাকাল না। ঐ লোক ছট ফট করছে। মালপত্র ফেলে ছুটে আসতে পারছে না আবার সামান্য একটা কুলী তাকে অপমান করে চলে যাবে এটাও বরদাস্ত করতে পারছে না। ভদ্রলোকের অনেক যন্ত্রণা।

একসময় এই সব মজা জয়নাল করেছে। এখন পারে না। এখন তার দশা কোমর-ভাঙ্গা কুকুরের মত। সত্যি সত্যি তার কোমর ভাঙ্গা। তিন-মণী বস্তা আচমকা পিঠে পড়ে গিয়ে শরীর অচল হয়েছে। একটা পা শুকিয়ে দড়ি দড়ি হয় যাচ্ছে। পা মাটিতে ফেলা যায় না। ব্যথায় সর্বাঙ্গ কাঁপে। আল্লাহর কি অদ্ভুত বিচার— চালের বস্তা পড়ল পিঠে,পা হয়ে গেল অচল। একের অপরাধে অন্যে শাস্তি পাচ্ছে। পা বেচারা তো কোন দোষ করে নি।

সকাল বিকাল দু'বেলা পায়ে পেট্রল মালিশ করলে কাজ হত। পেট্রল হচ্ছে বাতের মহৌষধ। আর তার পা যা হয়েছে তাকে এক ধরনের বাতই বলা চলে। কারণ অমাবস্যা পূর্ণিমায় ব্যথা হয়। বাত হচ্ছে একমাত্র অসুখ যার যোগাযোগ আকাশের চাঁদের সাথে।

পেট্রোল জোগাড় করাই মুশকিল। বোতলে করে তিন আঙুল পেট্রোল একবার মোটর ষ্ট্যাণ্ড থেকে নিয়ে আসল তার দাম পড়ল পাঁচ টাকা। কি সর্বনাশের কথা। পেট্রোলের বদলে কেরোসিন তেল মালিশ করলেও হয়। তবে কেরোসিন তেলে সে রকম ধক নেই বলে মালিশের সঙ্গে সঙ্গে এক চামচ করে খেতে হয়। খাওয়ার সময় নাড়ি ভুঁড়ি উল্টে আসে আর মুখ থেকে কেরোসিনের গন্ধ কিছুতেই যেতে চায় না।

অনেকদিন পায়ে পেট্রোল বা কেরোসিন কিছুই দেয়া হয় না বলে পায়ের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। সারাক্ষণ যন্ত্রণা করে। তবে গত দু'দিন কোন যন্ত্রণা করছে না। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। মাদারগঞ্জের পীর সাহেবের লালসুতা পায়ে বেঁধেছে বলে এটা হয়েছে কি-না কে জানে। পীর ফকিররা ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু করতে পারেন। তাদের 'জ্বীন-সাধনা' থাকে।

জয়নাল মাথা থেকে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মাথাটাকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। ঘুমানো দরকার। ঘুম আসছে না। ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেয়া ঠিক হয় নি। মনের খচখচানির জন্যেই ঘুম আসছে না। মাদারগঞ্জের পীর সাহেবের কাছ থেকে ঘুমের জন্যে একটা লাল সুতা আনা দরকার। ঘুম ভাঙ্গলে এখন আর ঘুম আসে না। বড় যন্ত্রণা হয়েছে।

জয়নাল পাশ ফিরে শোল আর ঠিক তখন আগের মত শিসের শব্দ। জয়নাল কম্বলের ভেতর থেকে মাথা বের করল। বজলু ফিরে এসেছে। আগের মত পায়ের কাছে কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়েছে। মনে হয় কোথাও জায়গা পায় নি।

এই বজলু। এই।

শিসের শব্দ থেমে গেল। বজলু বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করল।

এই রকম শব্দ হয় ক্যান?

বজলু মাথা নীচু করে বসে আছে। কিছু বলছে না। 'ছেমরা' ভয় পেল নকি?

শীত লাগে?

হু।

আয় কম্বলের নীচে আয়।

বজলু এক মুহূর্ত দেরী করল না। জয়নাল দরাজ গলায় বলল, এর পর থাইক্যা আমার সাথে ঘুমাইস অসুবিধা নাই।

আইচ্ছা।

দেশ কই?

চাইলতাপুর।

বাবা জীবিত?

না।

মা?

মা আছে।

আবার বিয়া হইছে?

হু।

সৎ বাপ তোরে নেয় না?

না।

চাচার সাথে ছিলি?

হু।

এখন চাচাও নেয় না?

বজলু জবাব দিল না। কম্বলের উষ্ণতায় তার চোখ ভেঙ্গে ঘুম নেমেছে। শিসের শব্দও এখন আসছে না। এই রকম অদ্ভুত একটি শব্দ হয়ত সে শীতের কারণেই করতো। আহা বেচারা। জয়নাল ছেলেটিকে হাত বাড়িয়ে আরো কাছে টেনে নিল। ঘুমুক। আরাম করে ঘুমুক।

ট্রেনের শব্দ আসছে। এটা কোন ট্রেন? জরিয়া ঝানজাইলের ট্রেন না-কি? আজ মনে হয় সময় মত এসে পড়েছে। না কি মালগাড়ি? মালগাড়ির চলাচল এখন আর আগের মত নেই। বিষয়টা কি মালবাবুকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়। জিজ্ঞেস করতে সাহসে কুলায় না। মালবাবুর মেজাজ খুব খারাপ। মেজাজ খারাপ, মুখও খারাপ। যা মুখে আসে বলে ফেলে। ভদ্রলোকের ছেলে এই ধরনের গালাগাল কার কাছে শিখল কে জানে। তবে মেজাজ ভাল থাকলে এই লোক অন্য মানুষ। খোঁজ খবর করে। এটা ওটা জিজ্ঞেস করে। এই যে গরম কম্বল জয়নাল গায়ে দিয়ে আছে এই কম্বলও পাওয়া গেছে মালবাবুর কারণে। একদিন কথা নেই বার্তা নেই একটা কম্বল তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, যা এটা নিয়ে ভাগ। হারামজাদা বান্দির পুলা তোরে যেন চোখের সামনে না দেখি।

জয়নাল মনের গভীর আনন্দ চাপা দিয়ে সহজভাবে বলার চেষ্টা করল, আমি আবার কি করলাম?

ওস্তরের বাচ্চা আবার মুখের উপরে কথা বলে। চোরের ঘরের চোর। গোলামের ঘরের গোলাম।

চোর বলায় জয়নাল কিছু মনে করে নি। চোর বলার হক মালবাবুর আছে। ঐতো কিছুদিন আগের ঘটনা দশটা টাকা দিয়ে মালবাবু বললেন, জয়নাল যা তো পাঁচ কাপ চা নিয়ে আয়। কাপ ভাল করে ধুয়ে দিতে বলবি গরম পানি দিয়ে। জয়নাল টাকা নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেল। তবে চায়ের দোকানের দিকে গেল না। তার সারাদিন খাওয়া হয়নি। সে মজিদের ভাতের দোকানে চলে গেল। ইঁরচালের মোটা মোটা ভাত আর মলা মাছের ঝাল তরকারী। দশটাকায় এত ভাল খাবার সে অনেকদিন খায়নি। মলামাছের এ রকম স্বাদের তরকারী সে এই জীবনে চাখেনি। ভাত খেতে খেতে সে ভাবছিল মজিদ ভাইয়ের পা ছুঁয়ে সালাম করে। যে এমন তরকারী রাঁধতে পারে তাকে সালাম করা যায়।

মালবাবুর সামনে পরের সাতদিনে সে একবারও পড়ল না। দূরে দূরে সরে রইল। লোকটার স্মৃতি শক্তি খুবই খারাপ। সাতদিন পর তার কিছুই মনে থাকবে না। এইটাই একমাত্র ভরসা। হলও তাই, সাতদিন পর যখন মালবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হল তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, কিরে তোর খোঁজ খবর নাই। কোথায় ছিলি?

জয়নাল বলল, শইলডা জুইত ছিল না। আপনে আছেন কেমুন? কাহিল কাহিল লাগতেছে।

চুপ কর হারামজাদা। আমারে কাহিল দেখায়। তোর মত অত বড় মিথ্যুক আমি জন্মে দেখি নাই। শুওরের বাচ্চা সমানে মিথ্যা বলে। লাথি খাইতে মন চায়?

জয়নাল হাসে। তার বড় ভাল লাগে। পরিষ্কার বোঝা যায় মালবাবুর মনটা আজ ভাল। নিশ্চয়ই অনেক মালামাল বুকিং হয়েছে। যখন প্রচুর মালামাল বুকিং হয় তখন তাঁর মেজাজটা ভাল থাকে। ওজনের হের ফের করে মালবাবু পয়সা পান। কাঁচা পয়সা। কাঁচা পয়সার ধর্ম হচ্ছে মানুষের মন ভাল করা। সব সময় দেখা গেছে যার হাতে কাঁচা পয়সা তার মনটা ভাল।

তোর পায়ের অবস্থা কিরে জয়নাল?

ভালা না।

চিকিৎসা করাচ্ছিস?

বিনা পয়সায় তো চিকিচ্ছা হয় না। তিন আঙুল পেট্রোলের দাম ধরেন গিয়া পাঁচ টেকা।

পেট্রোল দিয়ে কি চিকিৎসা?

পেট্রোল হইল আপনের বাতের এক নম্বর চিকিচ্ছা।

হারামজাদা বলে কি? তুই কি মোটর গাড়ি না-কি যে তোর পেট্রোল লাগবে? এই সব চিকিৎসা কোন শুওরের বাচ্চা তোদের শেখায় ...

মালবাবু সমানে মুখ খারাপ করেন। জয়নালের বড় ভাল লাগে। যাদের মুখ খারাপ তাদের মনটা থাকে ভাল। যা কিছু খারাপ মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। জমে থাকছে না। ভদ্রলোকরা খারাপ কিছুই মুখ দিয়ে বলেন না। সব জমা হয়ে থাকে। তাদের জামা কাপর পরিষ্কার, কথা বার্তা পরিষ্কার, চাল চলন পরিষ্কার আর মনটা অপরিষ্কার। এমনই অপরিষ্কার যে সোডা দিয়ে জ্বাল দিলেও পরিষ্কার হবার উপায় নেই।

এই জন্যেই কোন ভদ্রলোক বিপদে পড়লে জয়নালের বড় ভাল লাগে। ভদ্রলোক বিপদে পড়ে চোখ বড় বড় করে যখন এদিক ওদিক চায়, ফটাফট ইংরেজীতে কথা বলে তখন বড়ই মজা লাগে। তবে ভদ্রলোকরা সহজে বিপদে পড়ে না। বিপদে পড়ে তার মত মানুষ। ভদ্রলোক বিপদে পড়লে বিপদ কেটে বের হয়ে যেতে পারে। তারা পারে না। তারচেয়েও যেটা ভয়াবহ ভদ্রলোকরা তাদের বিপদ অন্যদের উপর ফেলে দিতে পারে।

তিন বৎসরের আগের ঘটনাটা ধরা যাক। বৈশাখ মাস। সকাল দশটায় ইয়াদ আলি তার এক নতুন সাগরেদ নিয়ে উপস্থিত। ইয়াদ আলিকে দেখেই ষ্টেশনে সাজ সাজ পড়ে গেল। ইয়াদ আলি যখন এসেছে তখন কাণ্ড একটা ঘটবে। ইয়াদ

হচ্ছে সারা ময়মনসিংহের এক নম্বর ঠগ। যে কোন লোককে সে ঘোল খাইয়ে দিতে পারে। থানার ও সি-কেও সে খোলা বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দিতে পারে। ওসি টেরও পাবে না যে সে বিক্রি হয়ে গেছে। ইয়াদ আলি অতি ভদ্র। অতি বিনয়ী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুন্দর চেহারা। লোকজন বলে ইয়াদ আলি উচ্চশিক্ষিত -বি এ পাশ। বিচিত্র না। হতেও পারে।

ইয়াদ আলি যখন এসেছে তখন একটা অঘটন ঘটবেই। সবাই মনে মনে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। জয়নাল জোঁকের মত ইয়াদ আলির পেছনে লেগে রইল। আজ সে কি করে তা দেখা দরকার।

ইয়াদ আলি ভৈরব লাইনের একটা গাড়িতে উঠে বসল। সেকেণ্ড ক্লাস কামরা। যাত্রী বোঝাই। নতুন বিয়ে হওয়া বর কনে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে। কামরা ওরাই বিজার্ভ করে নিয়েছে। শুধু এই কামরাই না পাশের একটা কামরাও রিজার্ভ। ইয়াদ আলি গাড়িতে উঠার সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন জন হা-হা করে উঠল— রিজার্ভ রিজার্ভ।

ইয়াদ আলি মধুর হেসে বলল, এটা যে রিজার্ভ সেটা জানি ভাই। জেনে শুনে উঠলাম।

নামুন নামুন।

নেমে যাব। গাড়ি চলার আগে নেমে যাব। শুধু একটা কথা বলার জন্যে উঠেছি।

কোন কথা না— নীচে যান।

এত অস্থির হলে তো ভাই চলে না। কি বলতে চাই এটা শুনেন। মসজিদ বানাবার জন্যে আমি চান্দা চাইতে আসি নাই। আপনাদের কাছে কোন সাহায্যও চাইতে আসি নাই। আপনারা আমাকে কি সাহায্য করবেন? আপনাদের নিজেদেরই সাহায্য দরকার। আমি একজন বয়স্ক মানুষ, আমার শরীরটাও ভাল না। সামান্য দুটা কথা বলতে এসেছি না শুনেই আপনারা চেঁচাচ্ছেন -নামুন নামুন। এটা কি ধরনের কথা? এটা কি ভদ্রলোকের কথা? আপনারা সব সময় মনে করেন ট্রেনে কেউ দু'টা কথা বলতে চায় মানে ভিক্ষা চায়। ভাই, আমাকে কি ভিক্ষুক বলে মনে হয়? এই কি আমাদের শিক্ষা? এই কি ....

ইয়াদ আলির মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি বেরুতে লাগল। বয়যাত্রী হতচাকিত। কেউ কেউ খানিকটা লজ্জিত। একজন বলল, কিছু মনে করবেন না। যা বলতে চান বলুন।

না আমি কিছুই বলতে চাই না। বলার ইচ্ছা ছিল। আপনাদের দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল। ভাবছিলাম মনের ব্যথার কথাটা বলি ..

এই পর্যায়ে ইয়াদ আলি থর থর করে কাঁপতে লাগল। মনে হচ্ছে সে রাগ সামলাতে পারছে না। মুখ দিয়ে ফেনা বার হচ্ছে। ইয়াদ আলি কথা বন্ধ করে এক হাতে বুক চেপে বলল, শরীরটা যেন কেমন লাগছে। এক গ্লাস পানি, এক গ্লাস পানি। বলতে বলতে মাথা চক্কর দেয়ার ভঙ্গি করে সে লম্বা লম্বি ভাবে কয়েকজনের গায় পড়ে গেল। দারুন হৈ চৈ। সবাই চেঁচাচ্ছে –পানি। পানি। হার্ট এ্যাটাক। হার্ট এ্যাটাক। ডাক্তার কেউ আছে ডাক্তার?

এই ভীড় এবং হট্টগোলের মাঝে ইয়াদ আলির সাগরেদ কনের দু'টি স্যুটকেস নামিয়ে ফেলল। নামাল সবার চোখের সামনে কেউ তা দেখলও না। জয়নাল শুধু বলল, ব্যাটা। সাবাস।

ট্রেন ছাড়ার আগ মুহূর্তে ইয়াদ উঠে বসল। বলল, শরীরটা একটু ভাল লাগছে। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে নামিয়ে দিল।

ঘটনার একদিন পরই দারুন হৈ চৈ। পুলিস এসে জয়নালের মত যে ক'জনকে পেল সবাইকে ধরে নিয়ে গেল। জানা গেল ইয়াদ আলির দল একত্রিশ ভরি সোনার অলংকার নিয়ে সরে পড়েছে। কনের কানে সামান্য দুল ছাড়া অন্য কোন অলংকার ছিল না। সব স্যুটকেসে ভরা ছিল।

বরের আপন মামা পুলিশের আইজি। তিনি প্রচণ্ড চাপ দিলেন। সেই চাপে গৌরীপুর ইষ্টিশনে জয়নালের মত সবাই গ্রেফতার হয়ে গেল। মজা মন্দ না। দোষ কে করে আর শাস্তি হয় কার।

পুলিশের কাজ কর্মও চমৎকার। কিছু জিগ্যেশ করাবার আগে খানিকক্ষণ পিটিয়ে নিবে। আরে বাবা কিছু প্রশ্ন কর। প্রশ্নের উত্তরে কি বলে মন দিয়ে শোন। সেটা পছন্দ না হলে তারপরে পেটাও। তা না প্রথমেই মার । রুলের গুঁতা। রুলের গুঁতা যে এমন ভয়াবহ জয়নালের ধারনাতেও ছিল না গুঁতা বসানো মাত্র বাবারে মারে বলে চিৎকার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তাও ভাল, পুলিশের কারণে বাপ মা'র কথা মনে পড়ল। পুলিশের গুঁতা না খেলে মনে পড়ত না। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতেই হয় পুলিশ একটা সৎকাজ করেছে। পিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এতে পুলিশের কিছু সোয়াব হয়েছে বলেও তার ধারনা।

মার খেলেও জয়নাল পুলিশের উপর খুবই খুশী কারণ পুলিশ কুলী সর্দার মোবারককেও ধরেছে। শুধু যে ধরেছে তাই না বেধরক পিটিয়েছে। রুলের গুঁতা

খেয়ে হারাজাদা রক্ত বমি করেছে। এত বড় একটা জোয়ান, পুলিশের কাছে কেঁচোর মত হয়ে গেছে— এটা দেখতেও ভাল লাগে। মোবারক শুধু যে কুলী সর্দার তাই না –গৌরীপুর ইষ্টিশনের ক্ষমতাবান মানুষদের একজন। ষ্টেশন মাষ্টারকেও তাকে সমীহ করে চলতে হয়। যদি মোবারকের সঙ্গে কখনো দেখা হয় ষ্টেশন মাষ্টার নরম গলায় বলেন— কি মোবারক ভাল?

পনেরোটার মত মালগাড়ির পুরানো ওয়াগন বিভিন্ন জায়গায় পরে আছে। এই সব ওয়াগনে দিব্যি সংসার ধর্ম চলছে। একেকটা ওয়াগন একেকটা বাড়ি। এই সবই মোবারকের দখলে। সে প্রতিটি পরিবার থেকে মাসে একশ টাকা ভাড়া কাটে। ভাড়ার অংশ বিশেষ ষ্টেশনের বড় অফিসাররা পায়, সিংহভাগ যয় মোবারকের পকেটে। একটা ওয়াগনে কয়েকজন দেহোপসারিণী থাকে। মোবারক তাদের তত্বাবধায়ক। তার নিজের দুই বিয়ে। অতি সম্প্রতি আরেকটি বিয়ে করেছে। এক বিহারী বালিকা— নাম রেশমী। ঐ বালিকার রূপ না–কি আগুনের মত।

জয়নালের মত লোকজন যাদের ষ্টেশন ছাড়া ঘুমানোর জায়গা নেই যারা নম্বরী কুলি নয় বা তেমন কোন কাজ কর্মও যাদের নেই তারা মোবারককে যমের মত ভয় পায়। মোবারকের ছায়া দেখলে তাদের আত্মা শুকিয়ে যায়।

সেই মোবারককেও পুলিশে ধরল এবং পুলিশের গুঁতা খেয়ে সে রক্ত বমি করল এই আনন্দের কাছে নিজের মার খাওয়ার ব্যথা কিছুই না।

দারোগা সাহেব যখন জয়নালকে বললেন, তুই কি জানিস বল? জয়নাল বলল, হুজুর মা বাবা (কথার কথা হিসেবে বলা। খাকি পোষাক পরা সবাইকে ঘন ঘন হুজুর মা–বাবা বলতে হয়) আমি কিছুই জানি না। লুলা মানুষ, এই দেখেন ঠাঙ–এর অবস্থা। আমার লড়নের শক্তি নাই।

নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামতেই দারোগা সাহেব রুল দিয়ে কোঁক করে পেটে আরেকটা গুঁতা দিয়ে বললেন,

একজনের কাজ না, এটা হল গ্যাং–এর কাজ। কারা আছে এই গ্যাং–এ বল। (আবার রুলের গুঁতা) ।

হুজুর মা–বাপ। হুজুরের সঙ্গে মিথ্যা বলব না, কে বা কাহারা এইটা করছে কিছুটা জানি না তবে আমার মনে সন্দেহ মোবারক কিছু কিছু জানে।

জয়নাল মোবারকের নামটা লাগিয়ে দিল। মোবারককে এরা ছিলে ফেললে তার মনটা শান্ত হয়। চামড়া ছিলে লবণ দেয়ার ব্যবস্থা থাকলে সে নিজের

পয়সায় লবণ কিনে দিত। দারগা সাহেব বললেন, মোবারককে তোর সন্দেহ? কেন শুনি? ইচ্ছা করে আরেক জনের নাম লাগাচ্ছিস। বজ্জাতের বজ্জাত।

হুজুর মা-বাবা, নাম লাগানীর কিছু নাই ইষ্টিশন কনট্রোল করে মোবারক। ইষ্টিশনে কি হয় না হয় সবই তার জাননের কথা।

বাবা তুই দেখি ইংরেজীও জানিস। ইষ্টিশন কনট্রোল। কে কাকে কনট্রোল করে এখন দেখবি। কোন বজ্জাতের পাছায় চামড়া থাকবে না। এক মাস পাছা রোদে দিয়ে শুকাতে হবে।

তিন দিনের দিন সবাই খালাস পেয়ে গেল। শুধু মোবারক আটকা রইল। সে ছাড়া পেল সপ্তম দিনে। তবে যে মোবারক ছাড়া পেল সেই মোবারককে কেউ চেনে না। শুকিয়ে চটিজুতা হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নিশ্চয়ই বেকায়দা জায়গায় পুলিশের রুলের গুঁতা লেগেছে। কিছু খেলেই বমি করে ফেলে। সেই বমির সঙ্গে রক্ত উঠে আসে।

মালবাবু তাকে দেখে আৎকে উঠে বললেন, আহা কি অবস্থা করেছে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করা নয়ত মারা পড়বি।

সিগন্যাল বাবু বললেন, এরা এত সহজে মরে না। দু'এক দিন যাক দেখবেন ঠিক আগের অবস্থা ।

সিগন্যাল বাবুর কথা ঠিক হল না। সাতদিনেও মোবারকের অবস্থা উনিশ বিশ হল না। আরও যেন কাহিল হল।

নতুন কুলী সর্দার হল হাশেম। মোবারকের ঘনিষ্ট সাগরেদ। এই হাশেমের দলই মোবরককে খুন করল।

ইঞ্জিন শান্টিং করছিল। নির্জন জায়গা লোকজন নেই। হঠাৎ সেই ইনজিনের সামনে মোবারককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হল।

হাশেম দৌড়ে এসে ষ্টেশন মাষ্টারকে খবর দিল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বিরাট একসিডেন্ট হইছে। মোবারক কাটা পড়েছে। শান্টিং ইন্জিনের নীচে পড়ছে। দক্ষিণের সিগন্যাল পয়েন্টের দশ পনেরো হাত পিছনে।

বলিস কি?

নিজের চউক্ষ্যে দেখা মাষ্টার সাব।

মোবারকতো নড়তেই পারে না সে এতদূর গেল কি ভাবে?

মউতে টানছে কি করবেন কন। মউতে টানলে না গিয়া উপায় নাই। বড়ই দুঃখের সংবাদ।

হাশেম চোখে গামছা দিয়ে খানিকক্ষণ কাঁদল। কান্নার ফাঁকে যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে মোবরক ভাই একটা মানুষের মত মানুষ ছিল। তার মৃত্যুতে দুনিয়ার যা ক্ষতি হল তা পূরণ হবার নয়।

তবে হাশেম সেই ক্ষতি দ্রুত পূরণ কবার চেষ্টা করল। মোবারকের তৃতীয় বউ রেশমা নামের বালিকাটিকে বিয়ে করল। রেল ওয়াগনগুলির কর্তৃত্ব নিয়ে নিল। কেউ বাধা দিল না। হাশেম মোবারকের মত মুর্খ ছিল না। সে একের পর এক ক্ষমতা দখল করল খুব সাবধানে। সেই সঙ্গে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধিও করল। মোবারক নম্বুরী কুলীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কখনো রাজি ছিল না। হাশেম সেই কাজটিই করল। কুলির সংখ্যা বাড়ুক। যত সংখ্যা বাড়বে ততই ভাল। সংখ্যা বাড়া মানে শক্তি বৃদ্ধি। একদিন জয়নালের কাছেও এল, জয়নাল ভাই নম্বুরী কুলীর দরখাস্ত করেন। সবে করতেছে।

জয়নাল বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, কি যে কন। আমার কি এই ক্ষমতা আছে? একটা বালিশ হাতে নিলে মনে হয় গারো পাহাড় হাতে নিলাম। দেহেন পাওডার অবস্থা। আমার মিত্যু সন্নিকট।

আইজ পাও খারাপ কাইল ভাল হইব। অসুবিধা কি। দরখাস্ত দেন। ফরমের দাম দুই টেকা।

গুণ্ডা পাণ্ডাদের সঙ্গে বিবাদ করে লাভ নেই। দরখাস্ত করে দিয়ে জয়নাল হল একচল্লিশ নম্বর কুলী। লাল সার্ট বানাতে হবে নিজের খরচায়। সার্টের বুক পকেটে নম্বর লেখা থাকবে। আরো নিয়ম কানুন আছে। সেই সব নিয়ম কানুন কাগজে কলমে লেখা।

১। যাত্রীগণের সহিত সদা সর্বদা ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে।

২। মাল পরিবহণে মণ প্রতি দুই টাকা হিসাব মানিয়া চলিতে হইবে। মালের ওজন প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন উঠিলে রেলওয়ে কর্মচারীদের সাহায্য নেয়া যাইবে।

৩। অবৈধ মালামাল পারাপার করা যাইবে না। কোন মালের ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া মাত্র রেলওয়ে পুলিশকে অবহিত করিতে হইবে।

টাকার অভাবে জয়নাল লাল জামাটা বানাতে পারেনি। লাল জামা থাকুক বা না থাকুক সে একজন নম্বুরী কুলী এটা কম কথা না।

গৌরীপুর রেল ষ্টেশনে ভোর হয়েছে।

চারদিকে ঘন কুয়াশা।

টু ডাউন মোহনগঞ্জ-ময়মনসিংহ প্যাসেঞ্জার ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীতে ট্রেন ঠাসা। হৈ চৈ কলরবের সীমা নেই। বজলু এখনো ঘুমুচ্ছে। জয়নাল বজলুকে রেখে ট্রেনের দিকে এগিয়ে গেল। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ট্রেন দেখলেই কাছে যেতে ইচ্ছা করে। আজ পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি? সেরে যাচ্ছে? বাদারীগঞ্জের পীর সাহেব মনে হচ্ছে সহজ পাত্র না।

এই বুড়ো এই?

তাকেই কি ডাকছে? তার বয়স চল্লিশও হয়নি এখনি তাকে বুড়ো ডাকছে। মাথার চুলগুলির জন্যে এরকম হয়েছে। কোমড়ে ব্যথা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব চুল পেকে গেল। আল্লাহর কি লীলা। সে ব্যথা গেল কোমরে। তার ফলে এক দিকে মাথার চুল পেকে গেল অন্য দিকে পা হল অচল। কোমরের কিছুই হল না। আল্লাহতায়ালার এটা কেমন বিচার?

এই বুড়ো এই।

জয়নাল এগিয়ে গেল। জানালার পাশে কচি কচি মুখের একটা মেয়ে বসে আছে। তার কোলে একটি শিশু। শিশুটি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। মেয়েটির পাশে তার স্বামী। সেই বেচারার কোলেও একটি শিশু। সেই শিশুটিও কাঁদছে। মনে হচ্ছে যমজ। যমজ বাচ্চারাই এক সঙ্গে কাঁদে হাসে। জামবাল বলল, কি বিষয় আব্বা?

একটু পানি এনে দিতে পারবে? খাবার পানি।

ঠিকই বয়েলের পানি আছে। ভাল পানি। এক চুমুকে খাইন ঠাণ্ডা।

আর গরম পানি দিতে পারবে?

আল্লাহ ভরসা। চায়ের দোকানে একটা টেকা দিলেই গরম পানি দিব।

এই নাও। এই ফ্লাস্কটাতে গরম পানি। আর এইটাতে রেগুলার পানি, মানে ঠাণ্ডা পানি।

গরম পানির জইন্যে দুইটা টেকা দেন আব্বা।

মেয়েটি টাকা খুঁজছে। তার বিশাল কালো ব্যাগে সম্ভবত এক টাকার কোন নোট নেই। মেয়েটির স্বামী বিরক্ত গলায় বলল, তুমি পানি আনার জন্যে এসব পাত্র দিচ্ছ কেন?

এ ছাড়া আর কি দেব? আর কি আছে?

মেয়েটির স্বামী ইংরেজীতে কি সব বলল, যার মানে খুব সম্ভব –এই লোক পাত্রগুলি নিয়ে পালিয়ে যাবে।

অরুণাভ ইংরেজী বুঝে না কিন্তু মানুষের অঙ্গভঙ্গি বুঝতে পারে। সে মেয়েটির স্বামীর দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বলল, মানুষকে এত অবিশ্বাস করা ঠিক না।

লোকটি মনে হচ্ছে এই কথায় লজ্জা পেল। পকে, মাঝে মাঝে লজ্জা পাওয়া ভাল। অনেকে লজ্জা পেলে দেখতে ভাল লাগে। তাদের মুখ লাল হয়ে যায়। কথা ঠিক মত বলতে পারে না। তোতলাতে থাকে।

মেয়েটি তার কাল বাসে টাকা খুঁজে পেয়েছে। সে স্বামীর দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধাঁধি একটি স্ল্যাক এবং পানি ভরা চমৎকার একটু গরম বানিয়ে বলল, খুব মিষ্টি কেমন!

অরুণ আসা।

তাড়াতাড়ি আসবে। আমি পাঁচ টাকা বকশীস দেব। বাতাসে খুব খারাপের মধ্যে।

অরুণাভ তার খোঁড়া পা নিয়ে যত সম্ভব দ্রুত এগুতে লাগল। ট্রেঞ্চ এবং গরম পানি নিয়ে বিছানা থেকে প্রায়ই উঠে না। সে সাইন টপকে বাসায় চলে গেল। জিনিস দু'টির জন্যে আশাতীত দাম পাওয়া গেল। দু'শ কুড়ি টাকা। তাড়াতাড়ি করলে আড়াইশ' পাওয়া যেত। যার যা পাওয়া যেতে তাই বা কম কি? দু'শ কুড়ি টাকা —যেন্না কথা না। মৃত এখন একেবারে খালি।

মাতা মুক্তির জন্যে খারাপ লাগছে। আহা অবোধ শিশু। পেটের জ্বালায় কাঁদছে। তবে আর কিছু একটা ব্যবস্থা করবেই। তাছাড়া শিশু হচ্ছে মেয়েলোক। আল্লাহতালা নিজেই এদের উপর লক্ষ্য রাখেন। খিদের জ্বালায় এরা কিছুক্ষণ কাঁদবে—এরপর আর নিজ আছে। চিৎকার করে কাঁদলে কুসফুস পরিষ্কার থাকে। কম কাশ, খাঁসানি এইসব কখনো হয় না। সব মন্দ জিনিসের একটা ভাল দিকও আছে।

ঘণ্টাখানেক পর অরুণাভ ট্রেনে ফিরল। ট্রেন চলে গেছে। ষ্টেশন ফাঁকা।

বন্ধু কম্বল জড়ে করে কাঁধে নিয়ে চুপচাপ বসে আছে। ঠোঙায় করে অরুণাভ পানি ভর্তি নিয়ে এসেছে। বন্ধুকে ঠোঙাটা এগিয়ে দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল, আরাম করে খা। বন্ধু আগ্রহ করে খাচ্ছে। অল্প অল্প তাকাচ্ছে অরুণাভের দিকে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় সে অভিভূত। অরুণাভ বলল, কেউ কি আসছে খুঁজছিস? বন্ধু না সূচক মাথা নাড়ল।

জয়নাল রেলওয়ে হিন্দু টি স্টলের সামনে বেজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দু টি ষ্টল চালায় পরিমল । তার ব্যবহার খুবই খারাপ, তবে চা বানায় ভাল। অন্য জায়গায় আধাকাপ চা দিয়ে এক টাকা রেখে দেয়, পরিমল তা করে না।

জয়নাল বলল, পরিমলদা এক কাপ চা দেহি, গরম হয় যেন।

পরিমল মুখ বিকৃত করে বলল, কাছে আয়। হা কর, মুখের মধ্যে চা বানায়ে দেই। গরম চা।

জয়নাল পরিমলের কথা শুনেও না শোনার ভান করল। সকাল বেলায় ঝগড়া করে লাভ নেই। পকেটে এতগুলো টাকা নিয়ে ঝগড়া করতেও মন চায় না। মানুষের যাবতীয় ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখতে ইচ্ছা করে।

পরিমলদা আমার এই পুলাডারে এককাপ মালাই চা দেও। সর যেন থাকে।

পরিমল চোখের কোণে বজলুকে এক ঝলক দেখল। শুকনো গলায় বলল, আগে টেকা দে— পাঁচ টেকা।

পাঁচ টেকা? কি কও তুমি?

মালাই-চা দুই টাকা কাপ। আর তোর কাছে আগের পাওনা দুই টেকা।

জয়নাল নিতান্ত অবহেলায় একশ টাকার একটা নোট বের করল। যেন এরকম বড় নোট সে প্রতিদিন বের করে। এটা কিছুই না। সে উদাস গলায় বলল, ভাংতি না থাকলে নোট রাইখ্যা দেও। যখন ভাংতি হয় দিবা।

টেহা পাইচস কই?

এইটা দিয়া তো তোমার দরকার নাই পরিমলদা। তুমি হইলা দোকানদার মানুষ। কাষ্টমার তোমারে হুকুম দিব সেই হুকুমে তুমি জিনিষ দিবা, পয়সা নিবা। তুমি হইলা হুকুমের গোলাম।

কথাটা বলে জয়নাল খুব তৃপ্তি পেল। উচিত কথা বলা হয়েছে। শালা মালাউনের এখন আর মুখে কথা নাই।

পরিমলের দোকানের চা আজ অন্য দিনের চেয়ে ভাল লাগল। চায়ের মধ্যে তেজপাতা দেয়ায় কেমন পায়েস পায়েস গন্ধ। জয়নাল দরাজ গলায় বলল, দেখি পরিমলদা অরেক কাপ। চিনি বেশি কইরা দিবা।

পরিমল আরেক কাপ চা বাড়িয়ে দিল। বজলু আগের কাপই এখনো শেষ করতে পারেনি। ফুঁ দিয়ে দিয়ে খাচ্ছে। একেকটা চুমুক দিচ্ছে আর জয়নালের দিকে তাকাচ্ছে। জয়নাল মনে মনে ভাবল, এই ছেলেটার একেবারে কুকুর স্বভাব।

কথার। কুকুরের মেজাজ দিলে সে মালিকের দিকে একটু পর পর তাকায় আর লেজ নাড়ে। এই খারামজাদাও তাই করছে। লেজ নেই বলে লেজটা নাড়তে পারছে না।

অরুনালের হঠাৎ মনে হল আল্লাহতালা সব জন্তুকে লেজ দিয়ে পাঠাল মানুষকে কেন দিল না? কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ সবারই লেজ আছে। মানুষের থাকলে তো কোন ক্ষতি হত না। আসলেই চিন্তার বিষয়। কাজিকে জিজ্ঞেস করে জিনিসটা জানা দরকার। অরুনালের মনে মাঝে মাঝে উদ্ভট শ্রেণীর কিছু চিন্তা ভাবনা আসে, তখন কেন জানি খুব ভাল লাগে। নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা বলে মনে হয়। বেশির ভাগ মানুষই তো এক পলের —খাও আর ঘুমাও। এর বাইরে কোন চিন্তা নেই। আল্লাহতালা মানুষকে চিন্তা করার যে "ক্ষেমতা" মানুষকে দিয়েছে সেই "ক্ষেমতা" কয়জন আর কাজে লাগায়।

কাই পরিমলদা। চা ভাল বানাইছ। একটা টেকা বেশী লাব। বখশীশ। তোমারে বখশীশ করলাম। হি-হি-হি।

খারামজাদা বখশীশ দেখায়। খালি খালি।

অরুনাল দাঁত বের করে হাসল। জায়গা মত অপমান করা হয়েছে। অনেকদিন মনে থাকবে।

ভাবতি টাকা সবই মেরেত দিয়েছে। খালকিন জাতের এই এক গুণ, টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব সাবধান। মুসলমান হলে বলত, টাকা থাকুক আমার কাছে। এখন ভাবতি নাই। ভাবতি হলে নিতি। ভাবনার আজ দিব কাল দিব করে খালি ঘুরাত।

বজলু পেছনে পেছনে আসছে। আসুক। অসুবিধা কি। উঁচু করা কম্বল বগলে ধরে আছে। অরুনালের জন্যে সুবিধাই হল— কাজ হাত পা। সাথে আছে চৌকিদার।

কিদা লাগছে না কি রে, ঐ বজলু?

হ।

হ কিরে ব্যাটা? পরটা আজি তো খাইলি একটু আগে। এখন খাইলি মালাই চা। এক মালাই চা খাইয়া একদিন থাকা যায়। কিদা সহ্য করার অভ্যাস কর। পরে কামে লাগব। এইসব অভ্যাস ছোড কেলায় করা লাগে। বুঝছস?

হ্ ।

পাল বিড়ির দোকান থেকে অরুনাল এক প্যাকেট হাল্কা সিগারেট কিনল। সিগারেট খায় না। আজ একটা প্যাকেট তার পকেটে এই আনন্দটা সে ভোগ

করতে চায়। সে হাঁটছে ষ্টেশনের শেষ মাথার দিকে। ঐ দিকে সিগন্যাল ঘর। সিগন্যাল ম্যান পাগলা রমজানের সঙ্গে তার মোটামুটি খাতির আছে। রমজানকে সে ডাকে রমজান ভাই। এবং বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কারণ ঐ লোকটা আর দশটা লোকের মত না। চিন্তা ভাবনা করে। কিছু কিছু চিন্তা বড়ই জটিল চিন্তা। যা জয়নালের মাথাতেও ঢুকে না। আবার কিছু কিছু চিন্তা পানির মত। বুঝতে অসুবিধা হয় না।

গত বর্ষায় এরকম একটা চিন্তা শুনে সে বড় অভিভূত হয়েছে। সেদিন শেষ বর্ষা। রমজান ভাই চাবির গোছা নিয়ে লাইন বদলাতে যাচ্ছে। কাজটা দেখতে সহজ হলেও আসলে সহজ না। একটা ভারী লোহার দণ্ড একদিক থেকে অন্য দিকে নিতে হয়। তখন খটাং করে লাইন বদল হয়। ট্রেন এলে আগের লাইনে না গিয়ে তখন যাবে অন্য লাইনে।

রমজান বলল, ও জয়নাল, আমার সাথে আয় ছাতা ধরবি। হাঁটতে পারিস তো?

পারি। চলেন যাই।

যেতে যেতে রমজান বলল, একজন কেউ সাথে থাকলে সুবিধা পয়েন্টার তুলতে কষ্ট হয়। বয়স হইছে রিটায়মেন্ট টাইম।

জয়নাল বলল, যখন দরকার হইব খবর দিয়েন। আমি আছি।

ঘুম বৃষ্টির মধ্যে ছপ ছপ করে হাঁটন যাচ্ছে। তখন রমজান একটা ভাবনার কথা বলল।

ও জয়নাল একটা কথা বলি শোন।

বলেন রমজান ভাই।

আমার বেতন হইল চাইর'শ টিন এর সাথে মেডিকেল দশ— চাইর'শ চল্লিশ। আমি মানুষটা ছোট শব্দের কিনা ক বেবি। চাইর'শ চল্লিশ টাকায় কি হয়? একটা ফোড়নও পাওন হয় না। ঠিক কি-না?

ঠিক।

এই আমার হাতে কি ক্ষমতা চিন্তা করস? একবার যদি লাইন উল্টা পাল্টা কইরা দেই তাইলে যে একসিডেন হইব সেই একসিডেনে মানুষ মরব —কম হইলেও এক হাজার।

কি সর্বনাশ।

এক হাজার মানুষের জান হাতের মুঠোয় নিয়া কাম করি। বুক ধড়ফড় করে। বুঝলি জয়নাল।

আমারো বুক ধড়ফড় করতাছে রমজান ভাই।

তোরে গোপনে একটা কথা কই — মন দিয়া শোন, একদিন দিমু একসিডেন বাজাইয়া।

কি কইলেন?

আমি এক কথা একবার কই, দশবার কই না।

একসিডেন বাজাইবেন?

হুঁ।

কোনদিন?

যে কোনদিন হইতে পারে। আইজও হইতে পারে।

কি সব্বনাশের কথা।

হুঁ হুঁ সব্বনাশ বলে সব্বনাশ। এর নাম সাড়ে সব্বনাশ। কথা কিন্তু গোপন রাখবি। কাক পক্ষীও যেন না জানে।

কাক-পক্ষী না জানার মত গোপন সংবাদ এটা না। স্টেশনে সবাই জানে পাগলা রমজান নাম তো শুধু শুধু হয়নি। এইসব কথাবার্তার জন্যই হয়েছে। তবে লোকটার মাথায় চিন্তা খুব ভাল খেলে। এই জন্যই তাকে খুব ভাল লাগে। লেজ বিষয়ক যে চিন্তাটা জয়নালের মাথায় এসেছে এর সহজ ব্যাখ্যা একমাত্র জয়নাল ভাই-ই দিতে পারেন।

রমজানকে পাওয়া গেল ঘুমটি ঘরে। জয়নালকে দেখেই বলল, কিরে জয়নাল আছস কেমন?

ভালা।

সাথে এই পুলা কে?

ইষ্টিসনের পুলা, আছে আমার সাথে। সিগারেট খাইবেন রমজান ভাই?

নিজের পয়সার ছাড়া অন্যের জিনিস খাই না।

জয়নাল এটা জানে। তবু ভদ্রতা করল। তার সঙ্গে ষ্টার সিগারেটের প্যাকেটটা আছে। রমজান ভাই রাজি থাকলে পুরো প্যাকেটটা দিয়ে দিত। বড় ভাল লোক। ভাল লোকের জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করে।

রমজান ভাই।

কী?

একটা চিন্তা আসছে মাথার মধ্যে। চিন্তাটা হইল লেজ নিয়া। সব জন্তুর লেজ আছে। এই যে ধরেন একটা টিকটিকি এরও লেজ আছে। মানুষও তো ধরতে গেলে একটা জন্তু এর লেজ নাই। এর কারণটা কি?

রমজানকে এই তথ্য মনে হল খুব নাড়া দিয়েছে। সে জোর করে বসে আছে। মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে।

জয়নাল?

জ্বি।

তাহলের খোরাক আমরা এরা মইরেছ। যেমি চিন্তা কইরা কিছু পাই কিনা।

আর তা হইলে মই রমজান ভাই?

রমজান হাঁ না কিছুই বলল না। আবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। জয়নাল তাকে আল চিন্তার খোরাক দিয়ে গেছে। শব জাতির লেজ আছে মানব জাতির লেজ নাই— বিষয়টা কি?

ভুলাশা থেকে লোক উঠেছে। মোহনগঞ্জের ট্রেন চলে এসেছে। আজ তুলনামূলক ভাবে ভীড় কম। ছাদের উপর মানুষ নেই। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন থেকে অনেকটাই আলাদা। লোকজন উঠছে নামছে, হৈ চৈ হচ্ছে। গামছাকাঁধে, লুঙ্গি-কামিজ, নিম ফুল পাঞ্জাবি, আবার খাকিপ্যান্টের টানার পাতা হাতে বৌলাদা, কফির মিশকিন কত ধরনের মানুষ এ কামরা থেকে ও কামরায় যাচ্ছে। কতগুলি মানুষের রুটি রোজগার এই ট্রেনের উপর নির্ভর করছে। কি বিরাট কর্মকাণ্ড। ভাল লাগে। দেখতে ভাল লাগে।

জয়নাল গম্ভীর স্বরে ডাকল, ও রমজু?

জ্বি।

তোমরাগো এই ট্রেন কইরে ক দেখি?

জানি না।

মোহনগঞ্জ। এইসব আমা দরকার বুঝলি। আমরা যারা ইটিশনে থাকি— ইটিশন হইল আমগোর রুটি রোজগারের মালিক। হেই মালিকের খোঁজ খবর না রাখলে জিনিসটা অন্যায় হয়। কিন্তু কইলাম না?

রমজু হাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

জয়নাল গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ইটিশনের মাঝে রুটি রোজগার বান্দা এমন মানুষ হইল দুই শ্রেণীর। একটি মানুষ আর একটি মানুষ। যারা ইটিশনের লগে সকাল চলে তারা একটি। আর যারা ইটিশনের লগে চলে না তারা একটি। ইদ্দেত বেশি কাটি মানুষের।

অনেকক্ষণ পর তাঁর সিগারেটের প্যাকেট খুলে অঞ্জনাল সিগারেট ধরাল। আগে কত সিগারেট খেয়েছে, এত ভাল লাগেনি, তখন সব সময় একটা আতঙ্ক ছিল এটা শেষ হলেই আরেকটা কখন জোগাড় হবে— কি ভাবে জোগাড় হবে? এখন এই অবস্থা না। ন'টা সিগারেট পকেটে আছে। একটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে ইচ্ছা করলে আরেকটা ধরাতে পারে। কারোর কিছু বলার নেই।

অঞ্জনাল মোহনগঞ্জ লাইনের গাড়িটার মুখোমুখি হয়ে জেঁকে বসল। সারাদিনে গায়ে প্রচুর রোদ লাগিয়ে রাখলে রাতে শীত কম লাগে। এইসব জ্ঞানের কথা সে অনেক ভেবে চিন্তে বের করেছে। অঞ্জনাকে শিখিয়ে যাবে। এই ছেলের কাজে লাগবে। ছেলেটির প্রতি সে যথেষ্ট মমতা বোধ করছে।

ও বাবু!

হ্যাঁ।

এই হাটিশনে আমি যখন পরথম আসি তখন আমি তোর মত আছিলাম। আমরা তিনজন অইসা উঠলাম। আমি, আমার বাপজান আর আমার ভইন — শাহেদা। তিনজনের মধ্যে আমি টিকলাম। বাপজান পরথম বছরই শেষ। শাহেদারে হাটিশন মাষ্টার খানার কাম দিল। তারপর যখন বদলি হইল সাথে নিয়া গেল। এখন কই আছে আল্লায় মালুম। তোর কিদা লাগছে?

না।

তুই খাড় বইয়া। একটা মালাই চা খাইয়া আসি। শইলডা জুইত লাগতাছে না। কম্বল সাবধান। ধর এই টাকার পাকেটে রাখ। জানাম — টাকাম মনে চাইলে খাইবি। বাপামের বড় গুণ কি জানস?

না।

বাপাম হইল কিসার ঘর। এক হুইক খানাম আর দুই গেলাস পানি হইলে পুরা একটা দিন পার করন যায়। মানুষের রোজগার পাতি সবদিন সমান হয় না— তখন এইসব বিদ্যা কাজে লাগে।

অঞ্জনাল উঠে দাঁড়াল। পা-টা আবার যন্ত্রণা দিচ্ছে। কখনোকে সে আমল দিল না। শরীরের ব্যথা-বেদনা, পেটের 'খিদা' এইসব জিনিসকে অগ্রাহ্য দিলেই এরা পেয়ে বসে। এদের সব সময় তুচ্ছ জ্ঞান করতে হয়।

পরিমলের দোকানে ভীড় এখন কম। মোহনগঞ্জের ট্রেন ঘন্টি দিয়ে দিয়েছে। কারিগররা উঠে চলে গেছে। পরিমলের ছোট শালা ট্রেনের কামরায় কামরায় চা ফেরি করে। ছোট গেলাস কাপ চা সে দিয়েছে, ফেরত এনেছে চৌদ্দটা কাপ। আরেকটা কাপের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ন'দশ বছরের ছেলেটা ভয়ে আতঙ্কে

[illegible]

[illegible]

[illegible]

জয়নালের পাশে বসে চা খাচ্ছে একজন অল্পবয়স্ক ক্যানভাসার। তার পরনে চকচকে প্যান্ট, সার্ট। হাতে এটাচি কেস। প্রথম দর্শনে মনে হবে ভদ্রলোক। সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী। শুধু অভিজ্ঞ চোখই বলতে পারবে — এ আসলে একজন ক্যানভাসার। যে শুল-বেদনার অমুধ, কিংবা কাম পাকার অষুধ বিক্রি করে।

জয়নাল লোকটির দিকে তাকিয়ে সহজ স্বরে বলল, ভাইজান কি

লোকটা প্রথম একটু চমকে উঠল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বাতের অষুধ।

নিজেই বানান?

হঁ। স্বপ্নে পাওয়া অষুধ। বত্রিশ পদের গাছের শিকড় লাগে। সব গাছও এই দেশে নাই। আসাম থেকে আনাতে হয়। বড়ই যন্ত্রণা।

জয়নাল মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এই ছেলে নিতান্তই আনাড়ি। ক্যানভাসিং-এ নতুন মেগেছে। সুবিধা করতে পারবে না। ক্যানভাসিংয়ে বুদ্ধি লাগে। এই ছেলে বোকা কিসিমের। জয়নাল গলায় কৌতূহলের ভঙ্গি করে বলল, স্বপ্নটা কে দেখল?

আমার পিতাজী দেখেছেন।

সব মানুষ স্বপ্নে কেবল বাতের অষুধ পায়, বিষয়টা কি কন দেখি? এই লাইনে পাঁচজন স্বপ্নে পাওয়া বাতের অষুধ বেচে। আপনেরে নিয়া হইল ছয়।

আমি এই লাইনের না। আমি ময়মনসিংহ-জামালপুর লাইনের।

স্বপ্নে এর চেয়ে ভাল কোন অষুধ পান না?

ভাল অষুধ মানে?

এই ধরেন কিধা নষ্ট হওনের অষুধ। তা হইলে গরীবের উপকার হইত।

লোকটি বিরক্ত চোখে তাকাচ্ছে।

জয়নাল বলল, আপনের পিতাজী যদি জীবিত থাকে তা হইলে তারে বলেন স্বপ্নে কিধার বড়ি জোগাড় করতে। খুব চলব। এক বড়িতে লাখপতি।

মশকরা করতেছেন?

না, মশকরা করব ক্যান? আপনে তো আমার দুলা ভাই না। নেন সিগারেট নেন। চা খাইবেন? খান আরেক কাপ। আমি দাম দিব। টেকা পয়সা হইল হাতের ময়লা। পরিক্কার দা ইনারে এক কাপ চা দেও, খরচ আমার।

হঠাৎ জয়নালের মন খারাপ হয়ে গেল। বাবা দুটোর জন্যে খারাপ লাগছে। তবে এতক্ষণে তারা ময়মনসিংহ পৌঁছে গেছে। একটা কিছু ব্যবস্থা তারা নিশ্চয়ই করেছে। তবে যাত্রা পথ ঐ লোক বোধ হয় তার মৌকে বকাবকা করেছে। রৌদ্র চোখের পানি ফেলেছে। আহা বেচারি। আহা

খুশী শরীর হাশেম লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছে।

জয়নালের বুকটা ধ্যাৎ করে উঠল। কিছু আনে না তো? হাশেমের অনেক গোপন নিজস্ব কারবার আছে। মালামাল পাচার হলে প্রথম জানাতে হবে হাশেমকে। বিক্রির ব্যাবস্থা হাশেমই করবে। দামের অর্ধেক হাশেমের বাকি অর্ধেক যে কাজটা করবে তার। তবে সেনাদানার বেলায় অন্য হিসাব।

জয়নাল বলল, হাশেম ভাই চা খাইয়া যান, খুব আসার।

হাশেম বলল, ঐ শুধু বৃটিশের জয়নালকে এক পলক দেখেই এগিয়ে গেল। কোন একটা বিষয় নিয়ে তাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে। তার ব্যাপারে কিছু জানে ফেলেনি তো? জানলে বিপদ আছে। খুব বিপদ।

চায়ের দোকান থেকে বের হবেই জয়নাল হুট করে এক থলি কমলা কিনে ফেলল। দশ টাকা করে থলি, দরদাম করলে আট দিত। দরদাম করতে ইচ্ছা করল না। কি আনন্দের সামান্য দু'টা টাকার জন্যে দেনাদেনি করা। গরীব মানুষ না হয় দু'টা টাকা বেশী পেল। বাকে মাঝে ফল ফলাদি খাওয়া দরকার। এতে শরীরে বল হয়। দুই হাতে চারটা কমলা দেখতেও ভাল লাগছে। এক্ষুনি খেয়ে ফেলতে হবে এমন তো কোন কথা না। থাকুক কিছুক্ষণ হাতে। জয়নাল মালবানুর ঘরের দিকে এগোল। মালবানুকে বদলি করে দেবে এরকম গুজব শোনা যাচ্ছে। এটা একবার জিজ্ঞেস করা দরকার। পড় আর লোক। হাতীর নিজের মত কড় দিল। মালবানুর ছেলে পুলে থাকলে কিছু কমলা কিনে দিয়ে আসত। চেকারের ছেলেপুলে নেই। ছেলেপুলে হওয়ানোটা কোন ব্যাপার না। পীর সাহেবের দাল সুজা কোরবে বাঁধলেই হয়। তবে বিশ্বাস থাকতে হবে। মালবানুর পীর ফকিরে বিশ্বাস নাই। জয়নাল একবার পীর সাহেবের কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে। পীর সাহেবকে নিয়েও খুব খারাপ কথা বলেছেন। খুবই অনুচিত কাজ করেছে। পীর ফকির নিয়ে ঠাট্টা

মশকরা করার ফল শুভ হয় না। এই যে বদলির কথা শোনা যাচ্ছে এর কারণও হয়ত তাই।

মালবাবুকে পাওয়া গেল না। তার ঘর তালাবন্ধ। তবে জানালা খোলা। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত চলে আসবেন। জানালা দিয়ে কমলা চারটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিলে কেমন হয়? দরজা খুলে কমলা দেখলে মনটা খুশী হবে। জনে জনে জিজ্ঞেস করবেন কমলা কে দিল? কেউ বলতে পারবে না। এটার মধ্যেও একটা মজা আছে। মালবাবু তার জন্যে অনেক করেছেন। সে কিছুই করতে পারে নি।

কোমরে চালের বস্তা পড়ে যাবার পর দুই সপ্তাহ হাসপাতালে ছিল। মালবাবু একদিন দেখতে গেল। দেখতে গেছে এই যথেষ্ট তার উপর কুড়িটা টাকা দিল। হাতীর দিলের মত বড় দিল না হলে এটা সম্ভব না। সামান্য কমলা দিয়ে এই ঋণ শোধ হবার না। এরচে বেশী সে করবেই বা কি?

টেবিলে কমলা ছুঁড়ে দেবার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে হল। মালবাবু রেগেও যেতে পারেন। তাঁর মেজাজের কোনই ঠিক ঠিকানা নেই। মেজাজ ঠিক থাকলে ফেরেশতা বেঠিক হলে শয়তানের বাদশা। মেজাজ ঠিক না থাকারই কথা। মালামাল মোটেই চলাচল হচ্ছে না। পরশু রাতেই হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, অফিসের সামনে শুয়ে থাকস ক্যানরে হারামজাদা? লাথি খাইতে মন চায়? পেট গলায়ে দিব। বদের হাড্ডি।

থাক কমলা চারটা বরং অনুফাকে দিয়ে আসা যাক । খুশী হবে। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। সে নিজের দোষের কিছু দেখছে না।

অনেকদিন অনুফাকে দেখতে যাওয়া হয় না। ছয় মাসের উপর তো হবেই। অবশ্যি এর মধ্যে দু'বার সে গিয়েছে। ঘরে লোক আছে শুনে চলে এসেছে। সকালবেলা লোকজন থাকবে না, তখন যাওয়া যায়। তাকে দেখলে অনুফা খুশী হয়। মুখে কিছু বলে না তবে সে বুঝতে পারে। অবশ্যি কিছুটা লজ্জাও পায়। লজ্জা পাওয়ার তেমন কিছু নেই। যা হচ্ছে সব আল্লাহর হুকুমেই হচ্ছে এটা জানা থাকলে লজ্জা চলে যাবার কথা। জগৎ সংসার তো এম্নি এম্নি চলছে না- তাঁর হুকুমে চলছে। এটা জানা থাকলে মনে আপনা আপনি শান্তি চলে আসে। অনুফাকে এই কথাটা গুছিয়ে বলতে হবে। অনুফার সামনে সে অবশ্যি গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। তার নিজেরো কেন জানি লজ্জা লজ্জা লাগে। কথা বলবার সময় বেশীর ভাগ কথাই গলা পর্যন্ত এসে আটকে যায়। সবচে মুশকিল হল

ইসানিং অনুকূল তাকে আপনি আপনি করে বলে। যেন সে একজন মান্যগণ্য লোক। বাইরের লোক।

এখন বাইরের লোক হলেও এক সময় তো ছিল না। রীতিমত বাড়ি যাওয়ে ডেকে নিয়ে পড়ানো হল। সেই বিয়েতে দশজন পড়ল ছয় সাড়ে তিনশ। তাও বিয়ের শাড়ি কিনতে হল না। মালবাবু শাড়ি কিনে নিলেন এবং মুখ বিকৃত করে বললেন, হারামজাদা বিয়ে যে করলি, বউকে খাওয়াবি কি? খাওয়াবি? ছোটলোকের বুদ্ধি শুদ্ধি হয় না, এটা একেবারে সত্যি কথা। বলেন না মুক্তকেশী বাতাস করে দেখেনি। পায়ের বলের আরেকটা, তার গলের বলের আরেকটা। আগুন ধরে। লাথি দিয়া হারামজাদা তোর দাঁত ভাঙ্গব। হলাবি না।

তা হলি আসলে সে কি করবে। হাটি বাদ্য একটি এখনের আগুনের ওপর বরফে কষ্ট করে থাকলে আর না। তখন মনে খুব স্ফূর্তি ছিল। একগুলি টাকা হাত হল। সবটাই তোলার হল মুটিতে। টাকার টাকা সুদ। কুলী শরীরের কাছ থেকে নেয়া। ধীর কাছে সুদে টাকা নেয়া মানে সারাজীবনের জন্যে ঋণ পড়া। সুদ দিয়েই কুল পাওয়া যাবে না আসল দিবে কখন। তবু অমলাল সব তুচ্ছ জ্ঞান করল। তখন শরীরে শক্তি ছিল। দুই মণী বোঝা হেলেলা টান দিয়ে তুলতে পারত। হাঁটুনের কাজ আড়াও বাইরে কাজ ছিল। সড়ক তৈরীর কাজ। দিনে কয়েক সড়ক তৈরীর কাজ। তখন গৌরীপুর শহরের সড়কে মাটি কাটা হচ্ছে। কাজের অভাব নেই শরীরে শক্তি থাকলে কাজ আছে। সকালের পর চলে আসত স্টেশনে এখানেও মাল তোলার কাজ আছে। অবশ্যি ঠেকাদারের সবটাই কুলী সর্দার নিয়ে নিত। টাকার টাকা সুদ, দিতে গিয়েই শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তার উপায় সে একটা ফন্দি বের করেছে। গৌরীপুরের রাজবাড়ির কাছে একটা ছোলার ঘর। জমিদারদের বিকলাঙ্গাদের ঘরের একটা অংশ। স্টেশন থেকে খানিকটা দূর। তাতে কি। হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরতে তার সকালই লাগত।

হেঁটে বাড়ি ফিরতে সে বসন্ত আসের স্বপ্ন দেখতো। সুদের টাকা সবটা দেয়া হয়েছে। তার পর টাকা জমাচ্ছে। টাকা জমিয়ে একদিন একটা রিকশা কিনে ফেলল। সেই রিকশা সে নিজে চালাবে না। ভাড়া খাটাবে। তখন টাকা জমে দু'দিক থেকে –আর টাকা এবং রিকশার টাকা। হয়তো জমতে অনেক হয়ে গেল। তখন তার জমি কিনল। কপোতাক্ষ নদীর তীরে প্রথমে ছোট্ট এক টুকরা জমি। তারপর আরেকটু, আরেক আরেকটু। একটা ঘর তুলল। টিনের ঘর। ঘরের চারপাশে ফল ফলাদির গাছ। পিছনে বাঁশ ঝাড়। বাঁশ ঝাড় ছাড়া ঘর ওঠে ভাল হয় না। ঘর বাড়ির আব্রু থাকে না। কল্পনার এই পর্যায়ে সে বাড়ি পৌঁছে যায়।

মনে হয় পথটা আরেকটু দীর্ঘ হল না কেন? আরেকটু দীর্ঘ হলে ভাল হত। আরো কিছুক্ষণ আশা যেত। পথে নামতেই পথ ফুরিয়ে যায়, এও এক আশ্চর্য কাণ্ড।

তার পায়ের শব্দে দরজার ঝাঁপ সরিয়ে অনুকা বের হয়ে আসে। নীচু গলায় বলে—আইজ অত দেরী হইল ক্যান?

রোজ একই প্রশ্ন। একদিন সে সন্ধ্যায় চলে এসেছিল। সেদিনও বলল, আইজ অত দেরী হইল ক্যান? জয়নাল হেসে বলল, এরে যদি দেরী কও তা হইলে যে বউ ঘরেই বইস্যা থাকন লাগে।

থাক না ক্যান? একটা পুরা দিন ঘরে থাকলে কি হয়?

টেকা জমান দরকার, অনুকা টেকা জমান দরকার।

টাকা অবশ্যি কিছু জমতে শুরু করল। বাঁশে ফুটো করে আজ এক টাকা, কাল দুটাকা এমনি করে ফেলতে লাগল। একবার ফেলল বিশ টাকার একটা নোট। খুব সুখের সময় ছিল।

দু'জনে একবার ছবিঘরে একটা বইও দেখে এল। অনেক শিক্ষণীয় জিনিষ ছিল বইটাতে। দেবর ভাবীর সংসার। দেবর তার ভাবীকে মায়ের মত শ্রদ্ধা করে। ভাবীও খুব স্নেহ করেন দেবরকে। ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দেন। এই দেখে স্বামীর মনে হল খারাপ সন্দেহ। তাঁর মনে হল দুইজনের মধ্যে ভালবাসা হয়ে গেছে। তিনি দু'জনকেই বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। তারা পথে পথে ঘুরে গান গায়, ভিক্ষা করে। খুব করুণ বই। কাঁদতে কাঁদতে অনুকা অস্থির। জয়নাল নিজেও কাঁদছে। দেবর ভাবীর দুঃখ সেও সহ্য করতে পারছে না। তবে একটা দিক ভেবে তার ভালও লাগছে এ জাতীয় সমস্যা তার নেই। সে বড় সুখী মানুষ।

বেশী সুখ কারো কপালে লেখা থাকে না। এটাও আল্লাহতালার বিধান। কাজেই অঘটন ঘটল। চালের বস্তা পড়ে গেল কোমরে। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। কাউকেই সে দোষ দেয় না। সবই কপালের লিখন। কথায় বলে না, কপালের লিখন না যায় খণ্ডন।

তার কপালে লেখাই ছিল কোমরে পড়বে তিনমুনী চালের বস্তা, তারপর অনুকা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। অনুকার উপরও তার রাগ নেই। যে স্বামী খেতে পড়তে দেয় না ঘামাঘা তার গলায় ঝুলে থাকবে কেন? তাছাড়া গায়ের রঙ ময়লা হলেও চেহারা ছবি ভাল। কোন পুরুষ মানুষ একবার তাকে দেখলে, দ্বিতীয়বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। সেই পুরুষের চোখ চক চক করে। এই মেয়ের কি দায় পড়েছে জয়নালের সঙ্গে লেপ্টে থাকার? জয়নালের তখন এখন মরে তখন মরে অবস্থা। হাসপাতাল থেকে কিছু হয় নি বলে চলে এসেছে ষ্টেশনে। একটা পয়সা

নেই হাতে। মাথার ভেতরে সব সময় ঝম ঝম করে ট্রেন চলে। কিছু মুখে দিলেই বমি করে ফেলে দিতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মনে হয় হঠাৎ যেন কেউ সারা গায়ে এক লক্ষ সূঁচ ফুটিয়ে দিল। সে তখন বিড় বিড় করে বলে –ভাই সকল আপনেরা ধরাধরি কইরা আমারে লাইনের উপরে শুয়াইয়া দেন। আমার জীবনটা শেষ হইক। কেউ তাকে লাইনের উপর শুইয়ে দেয় না বলে জীবন শেষ হয় না। মালখানার অফিসের সামনে মরলা বস্তার উপর সে শুয়ে থাকে। আর ভাবে জীবন জিনিসটা এমন জটিল কেন?

সেবার সে মরেই যেত। বেঁচে গেল দু'টা মানুষের জন্যে। মালবাবু আর রমজান ভাই। মালবাবু কয়েকদিন পর পর ডাক্তার নিয়ে আসতেন। কঠিন গলায় বলতেন, একটা ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলুন তো ডাক্তার সাহেব। মারতে পারলে একশ টাকা দেব। এরকম কষ্ট ভোগ করার কোন অর্থ নাই। অসাধ্য পরিশ্রম হওয়া দরকার। এগুলি হচ্ছে আগাছা। আপনি ইনজেকশন দিয়ে না মারলে আমি নিজেই লাঠি দিয়ে বাড়ি দিয়ে মাথা দু'ফাক করে দেব। মুখে এসব বলতেন আর ভেতরে টাকা দিয়ে অষুধ কিনতেন। দামী দামী অষুধ । টাকা তাঁর কাছে ছিল হাতের ময়লা।

আর পাগলা রমজান ভাই রোজই এটা সেটা এনে খাওয়াতেন। একবাটি দুধ। একটা কলা। সুজীর হালুয়া। সকল খরিচ দিয়ে মাখা ভাতের মাড়। পাশে বসে নানান কথা বার্তা বলতেন। সবই জ্ঞানের কথা। ভাবের কথা।

কষ্ট পাওয়া ভাল, বুঝলি রমজান। কষ্ট পাওয়া ভাল। কষ্ট হইল আগুন। আর মানুষ হইল খাদ মিশানো সোনা। আগুনে পুড়লে খাদটা চলে যায়। খাদে সোনা। তোর খাদ সব চলে যাচ্ছে বুঝলি?

রমজান ভাইয়ের কথা ঠিক না। কষ্টে পড়ে সে চোর হয়েছে। আগে চোর ছিল না। বোধ হয় তার মধ্যে সোনা কিছুই ছিল না। সবটাই ছিল খাদ। হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান না সব মানুষও তেমন সমান না। কিছু কিছু মানুষ আছে পুরোটাই সোনা আবার কিছু কিছু মানুষের সবটাই খাদ।

যাক এসব নিয়ে তার মনে কোন কষ্ট নাই। কারো উপর তার কোন রাগও নাই। সে যখন শুনল অনুপা ছমিরুদ্দিন রিকশাওয়ালার কাছে গিয়ে বসেছে সে রাগ করেনি। বরং ভেবেছে ভালই হয়েছে, মেয়েটার গতি হল। ছমিরুদ্দিন লোক খারাপ না। রোজগার ভাল। অনুপা খেতে পরতে পারবে। আরশের খুনের আসামীর সঙ্গে ঝগড়ায় টিকতে না পেরে চলে গেছে, তখন কিছুদিন বড় অশান্তিতে কাটল। জোয়ান বয়স। কোথায় যাবে? কোথায় ঘুরবে? আসল খবর পাওয়া

গেল অনুকূল একজন কাঠ মিস্ত্রীর কাছে বিয়ে বসেছে। কাঠ মিস্ত্রীর আগের বউ মারা গেছে। সেই পক্ষের তিন চারটা ছেলে মেয়ে আছে মানুষ করতে হবে। বউ দরকার। এই খবরে বড় আরাম পেল অরুণাস। যাক একটা গতি হল। আগের পক্ষের বউ যখন নেই তখন ফাতে গেলে সুখের সংসার। কাঠ মিস্ত্রী যখন, তখন রোজগার-পাতি খারাপ হওয়ার কথা না। মানুষের কপাল, এই বিয়েও টিকল না। শ্মশান ঘাট ঘুরে ফিরে আর জায়গা হল পাড়ায়। তা কি আর করবে। কপালের লিখন। অবশ্যি এদিক থেকে ভালই হল—স্বাধীনভাবে থাকবে। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। এই তো ভাল। ভালোর উপায় তো কারো হাত নেই। হুসেন-হোসেনের মত পেয়ারা নদীর দুই নাতীকেও কি কুৎসিত মৃত্যু বরণ করতে হল। জন্মে ছিল বলেই তো।

অনুকূল কাছে যাবার আগে অরুণাস নাপিতের কাছে গিয়ে মাথার চুল কাটাল। গোঁফ দাড়ি গজিয়েছিল। শেভ করাল।

কেমন হালকা লাগছে নিজেকে। আয়নায় দেখাচ্ছেও অন্য রকম। গায়ের সার্টটা অতিরিক্ত ময়লা। একটা সার্ট কিনে ফেলবে নাকি? পুরানো কাপড়ে বাজার ভর্তি। পনেরো কিংবা টাকায় ভাল সার্ট হয়। টাকা যখন আছে কিনে ফেললেই হয়। এক জোড়া স্যান্ডেলও দরকার। অনেক দিন ধরেই খালি পায়ে হাঁটছে। শখের একজোড়া স্যান্ডেলের কত দাম কে জানে? দশ টাকায় হবে না?

খালি হাতে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। অনুকূলের জন্যে কিছু একটা নিতে হবে। কমলা চারটা তো আছেই, এ ছাড়াও অন্য কিছু। একটা শীতের চাদর নিয়ে গেলে কেমন হয়? ফুল তোলা শীতের চাদরের খুব শখ ছিল বেচারীর। লাল রঙের চাদরে সাদা ফুল।

অনুকূলের কাছে ফেলনারেই সে খালি হাতে যায়নি। অতি তুচ্ছ কিছু হলেও নিয়ে গেছে। পান খেতে পছন্দ করতো বলে একবার একটা পানের বাটা নিয়ে গেল। বড় খুশী হয়েছিল সেবার। খুশী হয়ে আবার লজ্জাও পায়। লজ্জার কারণ যখন গেল লজ্জায় অনুকূল কথা বলতে পারছিল না। লাজুকভাবে মাথা নীচু করে বসেছিল। কোনক্রমে ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনের শরীল কেমুন?

'আপনি' ডাক শুনে অরুণাসের বুকের ভেতরটা ধ্ব-ধ্ব করে উঠল। তবে সে সহজ ভাবেই বলল, ভাল। তুমি কেমন আছ?

যেমন দেখতেছেন।

খুব ভাল আছে বলে জয়নালের মনে হয় না। অনুকার চোখের নীচে কালি। মুখ শুকনা। মাথার চুলগুলিও কেমন লালচে লালচে। তবু সুন্দর লাগছিল অনুকাকে।

অনুকা বসেছিল জলচৌকিতে। জয়নাল চৌকির উপর। চৌকিতে পাটি বিছানো। এক কোনায় ডেলাটিকটিকি বালিশ। ঘরের পাশ দিয়েই বোধ হয় নর্দমা গেছে। দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসে। ঘরের এক কোনায় তোলা উনুনের পাশে লম্বা লম্বা সবুজ রঙের বোতল। বোতলগুলির দিকে তাকিয়ে জয়নাল ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলতেই অনুকা বলল, অনেক কিসিমের মানুষ আসে। মদ খাইতে চায়। এগুই বোতল আনে। আমি শেষে বোতল বেইচা দেই।

তুমি খাওনা তো?

না।

খুব ভাল। ভুলেও খাইবা না। মদ হইল গিয়া নিশার জিনিষ। একবার নিশা হইলে আর ছাড়তে পারবা না। শইল নষ্ট হইব।

আমি খাই না।

না খাওনই ভাল।

এরপর জয়নাল আর কথা খুঁজে পায় না। কথা খুঁজে পায় না অনুকাও। দু'জনই অপরিচিত মানুষের মত মুখোমুখি বসে থাকে। একসময় জয়নাল বলে, উঠি কেমুন?

অনুকা দাবুক স্বরে বলে, আর একটু বসেন।

আইচ্ছা বসি।

অনুকা উঠে গিয়ে কোথেকে কেন চা নিয়ে আসে। সঙ্গে ছোট্ট পিরিচে একটা নিমকি, একটা কালোজাম। নিমকি, কালোজাম এবং চা জয়নাল খায়। না খেলে মনে দুঃখ পাবে। এত কষ্টের পয়সার রোজগার।

ফেরবার সময় হেঁটে হেঁটে অনুকা তাকে অনেক দূর এগিয়ে দেয়। জয়নাল বলে, যাও গিয়া আর আস কেন? ঘর খোলা।

অনুকা উদাস স্বরে বলে, থাকুক খোলা। ঘরে আছেই কি, আর নিবই কি?

অনুকা একেবারে সদর রাস্তা পর্যন্ত আসে। দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মোড়ে। জয়নাল যতবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ততবারই দেখে অনুকা দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঘোমটা। অনুকার চোখ বড় অসহায় মনে হয়। তাকে গৃহস্থ ঘরের বৌয়ের মতই লাগে। পাড়ার মেয়ে বলে মনে হয় না।

রাস্তার চেঙড়া ছেলেপুলেরা অনুফাকে দেখিয়ে অশ্লীল ইংগিত করে। সুর করে বলে— নডি বেডি। ন-ডি- বে-ডি। অনুফার তাতে কোন ভাবান্তর হয় না।

জয়নাল অনেকগুলি টাকা খরচ করে ফেলল, নিজের জন্যে চেক চেক সার্ট কিনল। এক জোড়া স্যাণ্ডেল কিনল। অনুফার জন্যে লাল চাদর। একটা বড় আয়না। অনুফার ঘরে ছোট্ট একটা আয়না সে দেখেছে। বড় আয়না পেলে খুশী হবে। আয়নার সঙ্গে একটা চিরুনী না কিনলে ভাল লাগে না। চিরুনীও কিনল। তার পরেও একশ টাকার উপর হাতে থেকে গেল। এই টাকাগুলি তো খুব বরকত দিচ্ছে। ফুরাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে কিছু টাকা হাতে আসে যেগুলি খুব বরকত দেয়। ফুরায় না। একবার ট্রেন থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছিল এই, এই, এই। সে অবাক হয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল। মেয়েটা বলল, মা একে ভিক্ষা দাও।

জয়নাল হাসি মুখে বলল, আম্মাজী আমি ফকির না।

ফকির না হলেও ভিক্ষা দাও। মা একে ভিক্ষা দাও।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিচ্ছে। মেয়েটির মা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে কোন ভাংতি পাচ্ছেন না। মেয়ে ক্রমাগত মাকে দিল তাড়া। মা দাও না,দাও না? ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত অতি বিরক্ত মুখে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন। ঐ টাকা খুব বরকত দিয়েছিল। কিছুতেই শেষ হয় না। এটা ওটা কত কি কিনল, তার পরেও দেখা গেল পকেটে কুড়ি টাকার একটা নোট রয়ে গেছে। ঠিক করল এই টাকাটা অনুফাকে দেবে। আহা বেচারী কত কষ্ট করছে থাকুক তার হাতে কুড়িটা টাকা।

অনুফা কি ভাবল কে জানে। মেয়ে মানুষের মন অন্যকিছু ভেবে বসে ছিল হয়ত ছিল হয়ত। কেঁদে কেটে অস্থির। কিছুতেই টাকা নেবে না। শেষ পর্যন্ত নিলই না। চোখ মুছতে মুছতে আবার আগের মত রাস্তার মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল। রাস্তার বদমায়েশ ছোকরাগুলি আগের মত চেঁচাতে লাগল –নডি বেডি যায়। নডি বেডি যায়। ছোকড়াগুলি বড় বজ্জাত। ইচ্ছা করে এদের চামড়া ছিলিয়ে গায়ে লবণ মাখিয়ে রোদে বসিয়ে রাখতে।

জয়নাল অনুফার ওখানে পৌঁছল দুপুরের কিছু আগে। পাড়ার মেয়েদের কাছে আসার জন্যে সময়টা খারাপ। ওরা এই সময় ঘরের কাজকর্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমায়। রাত জাগার প্রস্তুতি নেয়। অনুফাও হয়ত ঘুমুচ্ছে। কড়া নাড়লে ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলবে। দরজা খুলেই লজ্জিত ভঙ্গিতে বলবে –আপনের শইল এখন কেমুন? পায়ের বেদনা কমছে?

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর যে দরজা খুলল তার নাম অনুফা নয়। এ অন্য একটা মেয়ে। খুবই অল্প বয়স। ষোল সতেরও হবে না। চোখে মুখে এখনো কিশোরীর লাবণ্য। মেয়েটি আদুরে গলায় বলল, এইটা বুঝি আসবার সময়? তা আসছেন যখন আসেন।

জয়নাল বলল, অনুফা নাই?

ও আচ্ছা অনুফা আফা? না উনি এইখানে নাই। হেতো অনেকদিন হইল ঢাকায়— তা ধরেন পাঁচ ছয় মাস। আসেন না, ভিতরে আসেন। দরজা ধরা মাইনষের সাথে গপ্প করতে ভালা লাগে না।

ঢাকায় গেছে কি জইন্যে?

রোজগারপাতি নাই। কি করব কন? পাঁচ ছয় জন এক লগে গেছে। আমরা ছয়ঘর আছি। আসেন না ভিতরে আসেন। টেকা না থাকলে নাই। চিন-পরিচয় হউক। যেদিন টেকা হইব -দিয়া যাইবেন।

জয়নাল ঘরে ঢুকল। আগের সাজসজ্জায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই মেয়েটা সম্ভবত শৌখিন। চৌকিতে ফুলতোলা চাদর। ঘরের মেঝে ঝকঝকে তকতকে। বড় একটা আয়নাও এই মেয়ের আছে।

বসেন। দাঁড়ায়ে আছেন ক্যান? চিয়ারে বসেন।

জয়নাল পুটলিটা বাড়িয়ে উদাস গলায় বলল, তুমি এইগুলি রাখ। চাদর আছে একটা, আয়না চিরুনী আর চাইরটা কমলা।

মেয়েটা দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। জিনিষগুলি এক ঝলক দেখেই পুটলিটা চৌকির নীচে রেখে দেয়। সম্ভবত তার মনে ভয় লোকটা হঠাৎ মত বদল করে জিনিষপত্র নিয়ে চলে যেতে পারে।

আমার নাম ফুলী। এই পাড়ায় দুইজন ফুলী আছে। যখন আইবেন— জিগাইবেন ছোট ফুলী। খাড়াইয়া আছেন ক্যান? বসেন। দরজা লাগায়ে দিমু?

না ফুলী আইজ যাই।

এটা কেমুন কথা। যাইবেন ক্যান? আসছেন চিন-পরিচয় হউক।

জয়নাল কথা বাড়াল না। তার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে। সে বেরিয়ে এল। এই মেয়েটাও অনুফার মত সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

জয়নাল বলল, তুমি আসতেছ ক্যান? তুমি ঘরে যাও।

ফুলী আদুরে গলায় বলল, ভাংতি টেকা থাকলে দিয়া যান। ঘরে কেরাচি কিননের পয়সা নাই। হাত একেবারে খালি।

অমলাল তেবেই এসেছি—চকমকে একশ টাকার নোটটা অনুকূলকে দিয়ে আসবে। নিতে না চাইলেও জোর করে দিয়ে। এই মেয়ে নিজ থেকে চাইছে। অনুকূলের সঙ্গে আর তো তেমন কোন তফাৎও নেই। তাছাড়া এক অর্থে সব মানুষই তো এক। অনুকূলকে দেয়া যে কথা এই মেয়েটিকে দেওয়াও তো তাই।

আপনের কাছে কিছু আছে? চাইয়া পাঁচ টেকা হইলেও হইব। না থাকলে কোন কথা নাই। চিন-পরিচয় হইল এইটাও কম কথা না।

অমলাল একশ টাকার নোটটা বের করল। সেই মেয়ে খুশী তা নিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেঁধে ফেলল আঁচলের গিঁট। মেয়েটি বিদায় যাচ্ছে। অমলালের সঙ্গে রাস্তার মোড় পর্যন্ত আসার প্রয়োজন আর নেই। এলে অমলালের ভাল লাগতো। ঝিম ধরা দুপুরে একটা মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকাচ্ছে যারা যাচ্ছে তাদের, এই দৃশ্য বড়ই মধুর।

ভাল লাগছে না। অমলালের কিছু ভাল লাগছে না। পঞ্চাশ পুরনো কথা ফিরে এসেছে। পুনিমা কোথায় গেছে কি-না কে জানে। মনে হয় গেলেছে, নতুবা আচমকা এই ব্যথা শুরু হত না।

অমলাল রিকশা ডাকল। বুড়ো রিকশাওয়ালা এগিয়ে এল। এই রিকশাওয়ালাকে অমলাল চিনে, ইদ্রিসদিন। দুইজনই জন তবুও কেউ কাউকে চেনে না। শুধু রিকশা থেকে নেমে দু'টাকা ভাড়া দেবার সময় অমলাল বলল, ইদ্রিসদিন ভাইয়ের শরীরটা ভালা?

ইদ্রিসদিন বলল, ভালা।

আমারে চিনছেন তো? আমি অমলাল।

চিনছি।

অনুকূলের খোঁজে গেছিলাম। শুনলাম চাকরি গেছে।

জানি।

অমলাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, অনুকূলের এই খবর অনেকেই জানে। শুধু সেই জানে না। চাকরি তো এই স্টেশন দিয়েই যেতে হয়েছে। একবার খোঁজও নেয়নি। সেতো কথা দিত না। কথা দিয়ে কি হবে? সে কাজ দেবার কে? যদার আগে পরিমলদার দোকান থেকে এককাপ গরম চা খাইয়ে দিত। খালাতো তুলতে সাহায্য করত। কথার আসরে বসে দিত। ট্রেন যখন ছেড়ে দিত সে জানলা ধরে ধরে এগিয়ে যেত। এর বেশী আর কি?

এই স্টেশনে কত প্রিয়জনের বিদায় দৃশ্য সে দেখেছে— কত মধুর সেই সব দৃশ্য। বিয়ের পর মেয়ে স্বামীর সঙ্গে চলে যাচ্ছে। মেয়ের বাবা মা ভাই বোন এরা

সবাই ষ্টেশনে এসেছে বিদায় দিতে। ট্রেন চলতে শুরু করা মাত্র এরা সবাই ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করল। যেন কিছুতেই এই ট্রেনকে তারা চোখের আড়াল করবে না। মেয়ের বৃদ্ধা দাদী তিনিও দৌড়াচ্ছেন। গার্ড সাহেব এই দৃশ্য দেখে বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন থামিয়ে দিলেন। গম্ভীর মুখে বললেন ব্রেকে গণ্ডগোল আছে —এই ট্রেন এক ঘন্টা লেট হবে। আহা এই গার্ড সাহেবের মত লোক হয় না। এরা আসলে ফেরেশতা। মানুষের সাজ পোষাক পরে ঘুরে বেড়ায়। সবাই ভাবে সেও বুঝি আমাদের মতই একজন মানুষ।

জয়নাল ষ্টেশনে গেল না। ওভারব্রীজের উপর চুপচাপ বসে রইল। যত দূরে চোখ যায় লম্বা রেল লাইন চলে গেছে। বড় ভাল লাগে দেখতে। ঐতো যাচ্ছে ভৈরব লাইনের গাড়ি। কোথায় ভৈরব কে জানে? ভৈরবের পরে কি আছে? একেবারে শেষ মাথায় কোন ষ্টেশন? এমন যদি হত যে লাইনের কোন শেষ নেই— যেতেই থাকে, যেতেই থাকে— তাহলে বেশ হত। শেষ ষ্টেশনটা কি জানার জন্যে সে উঠে বসতো। চলুক ট্রেন, চলতে থাকুক। ঝিক ঝিক করে গন্তব্যহীন গন্তব্যে যাত্রা।

জয়নালের মন খারাপ ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। ওভারব্রীজের উপর উঠে তা যেন আরো বাড়ল। উপর থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া রেললাইন চোখে পড়ে। মন আপনা থেকে উদাস হয়। তার উপর অনেক দিন পর বেলায়েতকে দেখা যাচ্ছে। বেলায়েত গান গেয়ে ভিক্ষা করে। তার পাশে বসে থেকে তার মেয়ে আপন মনে খেলে। কখনো ইচ্ছা হলে আচমকা মিষ্টি রিনরিনে গলায় বাপের গলার সঙ্গে সুর মেলায়। শুনতে বড় মিষ্টি লাগে। বেলায়েত বেসুরো গলায় মাথা নেড়ে নেড়ে গাইছে...

....দিনের নবী যেতকায়
রাখা দিয়া হাইটা যায়
একটা পাখি সেই সময়
ডাকতে ছিল আপন মনে
গাছেরও পাতার সো গাছেরও পাতায়....।

আজ বোধ হয় বেলায়েতের মেয়ের মনটা ভাল। বাপ থামার সঙ্গে সঙ্গেই ছোট্ট মাথা দুলিয়ে গেয়ে উঠল... গাছেরও পাতায় রে গাছেরও পাতায়।

জয়নাল পীর ভিকারির একটা নোট বাপের কেলে দিল। কেলায়েত বিস্মিত হয়ে জয়নালকে এক পলক দেখেই নোট সরিয়ে ফেলল। পাঁচ টাকার নোট একটা পড়ে আছে দেখলে অন্যরা ভিক্ষা দেবে না।

কেলায়েত অস্থিরে অনেকদিন পরে দেখলাম। গেছিলেন কই?

শম্ভুগঞ্জ।

সইল আসা তো?

আল্লার রাখছে।

শম্ভুগঞ্জে আয়োজনার কিছু হইছে?

হইছে কিছু।

হইলে মেয়েটারে জামা টামা কিনা দেন। শীতের মইধ্যে খালি গাও।

কেলায়েত নীচু গলায় বলল, জামা আছে। স্যুয়েটারও আছে। খালিগাও থাকলে ভিক্ষার সুবিধা। কেলায়েতের মেয়েটা মিচকি মিচকি হাসছে। হাতে চাটাই কড়ি। কড়ি খেলছে—হিসেব করছে। এই মেয়েটাকে দেখলেই জয়নালের শাহেদার কথা মনে হয়। শাহেদাও বাপজানের পাশে বসে আপন মনে কড়ি খেলত। কেলায়েত এখন যে জায়গায় বসে ভিক্ষা করছে টিনের একটা থালা নিয়ে ঠিক এই জায়গায় বসতেন বাপজান। ভিক্ষা করতে লজ্জায় তাঁর মাথা কাটা যেত— শুধু তোতাপাখির মত বলতেন,

বাপধন গরীবরে সাহায্য করেন।

বাপধন গরীবরে সাহায্য করেন।

মাঝে মাঝে বাপজানকে ভেংচি কাটতে শাহেদা। আবিদুল তাঁর মত গলায় বলতো—

বাপধন গরীবরে সাহায্য করেন।

বাপধন গরীবরে সাহায্য করেন।

জয়নালের বাবা রাগ করার বদলে হেসে ফেলতেন।

গরমের সময় তারা ঘুরতো ওভারব্রীজে। মশা কম, ফুরফুরে বাতাস। শাহেদা বলত—একটা কিচ্ছা কও, বাজান। এই কথাটির জন্যেই যেন অপেক্ষা। কথা মাত্র গল্প শুরু হত। শুরু হত—

কিচ্ছা বত

মিচ্ছা তত— এই ভাবনা নিয়ে। মজার মজার সব গল্প। ওভারব্রীজে তাদের সেই জীবন খুব খারাপ ছিল না। কেলায়েত এবং তার কন্যার জীবনও বোধ হয় খারাপ না। আল্লাহতায়ালার বড় একটা ঋণ হচ্ছে কাউকে দুঃখ দিলে সমপরিমাণ সুখ দিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করেন।

জয়নাল বলল, বেলায়েত ভাই-যাই। সইন্ধ্যার আগেই মেয়েটারে জামা পরাইয়েন। ঠাণ্ডা লাগবে মুশকিল। এই বছর শীত পড়ছে বেজায়। বেলায়েত জবাব দিল না। গানে টান দিল। এইবার নতুন গান—মনে বড় আশা ছিল-বাব মদীনার।

ইষ্টিশনে পা দিয়ে জয়নাল হকচকিয়ে গেল। অনেক পুলিশ। রেলওয়ে পুলিশ না। রেলওয়ে পুলিশ আনসারেরও অধম আসল পুলিশ। জয়নালের বুক ছ্যাৎ করে উঠল। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বস্ত হল। তার সামান্য চুরির ব্যাপারে এত পুলিশ আসবে না। অন্য কোন ব্যাপার। জানা গেল হিরণপুর ষ্টেশনের কাছে মালগাড়ি থেকে দশ বস্তা চিনি চুরির তদন্ত হচ্ছে। দারোগা সাহেব খোঁজ খবর করতে এসেছেন। আসামীদের একজন ধরা পড়েছে, সে গৌরীপুর ষ্টেশনের নম্বরী কুলী। ওসি সাহেবের যারনা অন্যদেরও যোগ থাকতে পারে। সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জয়নালকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাকা হল। রেলওয়ে পুলিশের ছোট ঘরে এক এক করে ডাকা হচ্ছে, এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এ কি যন্ত্রণায় পড়া গেল। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের নমুনা সে জানে। পুলিশ আদর করে কখনো কিছু জিজ্ঞেস করে না। প্রশ্ন করার আগে পেটে কলের একটা গুঁতা দেয়। প্রশ্ন শেষ হলে আরেকটা দেয়। কে কি বলল, না বলল তাতে কিছু আসে যায় না। সত্যি বললেও গুঁতা মিথ্যা বললেও গুঁতা।

ওসি সাহেব বললেন, তোমার নাম জয়নাল না?

জয়নাল ওসি সাহেবের স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই কবেকার কথা এখনো মনে আছে। এই না হলে থানার ও সি।

জয়নাল না তোমার নাম?

জ্বি স্যার।

ওয়াগনে লুটের সময় তোমার সাথে আর কে কে ছিল?

জয়নাল কিনরে ভেঙ্গে পড়ে বলল, হুজুরের যখন আমার নামটা স্মরণ আছে তখন আমার পাওভার অবস্থাও নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। এই পাও নিয়া আমি ওয়াগন লুট করতে পারলে তো কামই হইছিল। হুজুর পাওভার অবস্থা নিজের চোখে দেখেন।

জয়নাল লুঙ্গী সরিয়ে পা দেখাল। তাতেও ওসি সাহেবের বিশেষ ভাবান্তর হল না। তিনি কঠিন গলায় বললেন, লুটের মালের ভাগতো ঠিকই পাইছস। নতুন সার্ট নতুন স্যাণ্ডেল।

এইগুলো হুজুর বখশীশের টাকায় কিনা

বখশীশের টাকা?

জ্বি হুজুর। আপনে মা-বাপ, আপনের কাছে মিথ্যা বইল্যা লাভ নাই। এক প্যাসেঞ্জারের ছোট বাচ্চা কান্তেছিল। তার দুধের জইন্যে গরম পানি আইন্যা দিলাম। বাচ্চার মা খুশী হয়ে একশ টাকা বখশীশ করল।

একশ টাকা বখশীশ?

বড়লোকের কারবার। টাকা পয়সা এরার হাতের ময়লা। আমার কথা যদি হুজুরের বিশ্বাস না হয় কোরান শরীফ আনেন। মাথার উপরে কোরান শরীফ রাইখ্যা তারপর বলব।

আচ্ছা যা ভাগ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জয়নাল বের হল। বিরাট বড় একটা ফাড়া কেটেছে। আরেকটু হলে ফেঁসে গিয়েছিল।

ওসি সাহেব যদি বলতেন—কার কাছ থেকে গরম পানি আনলে? তাহলেই সর্বনাশ হয়ে যেত। মিথ্যা কথা বেশীক্ষণ বলা যায় না। একের পর এক মিথ্যা বলতে থাকলে জিহ্বা ভারী হয়ে যায়। তোতলামি এসে যায়। একবার তোতলামি এসে গেলে আর দেখতে হত না। জয়নাল বজলুকে খুঁজে বের করল। কি অদ্ভুত ব্যাপার। সে তাকে যেখানে বসিয়ে রেখেছিল সেখানেই বসে আছে। গাধা না -কি ছেলেটা? এই ছেলে টিকবে কি করে? এর কপালে দুঃখ আছে।

কিছু খাইছস? ঐ বজলু।

না।

খাস নাই ক্যান?

বজলু মাথা নীচু করে আছে। তার বগলে ভাজ করা কম্বল। কম্বল সে হাতছাড়া করে নি। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে জীবন দিয়ে দেবে তবু সে কম্বল দিবে না।

টেকাতো একটা তোরে দিছিলাম। বলছিলাম কি? এক ছটাক বাদাম কিন্যা দুই গেলাস পানি খাইলে ক্ষিধা শেষ। বাদাম কিনলি না ক্যান।

বজলু কিছু বলল না। তবে এখন তার চোখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে জয়নালকে আবার দেখতে পেয়ে তার বুকে হাতীর বল ফিরে এসেছে। জয়নালকে সে দেখতে পাবে এই আশা সে প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে

কেঁদেছেও। অজানা সব দুঃশ্চিন্তাতে সে অস্থির ছিল। ক্ষিধের কথা তার মনেই হয়নি। তখন ক্ষিধেয় চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে।

চল যাই—ভাত খাই। আইজের দিন যত মন চায় খাইবি। কাইল থাইক্যা ঠন ঠনাঠন।

বজলু ক্ষীণ স্বরে বলল, আফনেরে খুঁজতেছে।

কে খুঁজতেছে?

হাশেম। সর্দার হাশেম।

তুই চিনস তারে?

জ্বি ।

আমারে খুঁজে ক্যান। বিষয়ডা কি? কিছু কইছে?

না।

কিছুই কয় নাই?

না।

জয়নালের মন আবার অস্বস্তিতে ভরে গেল। কিছু কি টের পেয়েছে? ইষ্টিশনে থাকাও এক যন্ত্রণা। দুশ্চিন্তায় জয়নাল ভালমত খেতে পারল না। বজলু খুব আরাম করে খাচ্ছে। অনেকদিন পর এই প্রথম বোধহয় ভাত খাওয়া। কেমন চেটে পুটে খাচ্ছে।

আর চাইরটা ভাত নিবি?

না।

শরম করিস না। ক্ষিধা থাকলে – ক। দিব আর এক হাফ?

জ্বি।

আরে ব্যাটা, তুই জ্বি কোনখানে শিখলি? কথায় কথায় জ্বি। ইসকুলে পড়ছস?

বজলু হ্যাঁ–সূচক মাথা নাড়ল।

কোন কেলাস ছিলি?

ফোর।

ইসকুল পড়তে মন চায়?

জ্বি।

মন চাইলেই তো আর হয় না ব্যাটা। ভাইগ্যের ব্যাপার। ভাইগ্যে থাকলে হয়। না থাকলে হয় না। এই সব নিয়া মন খারাপ করিস না। পেট ভইরা ভাত খা। এই পুলারে আর এক হাফ ভাত দেও। ডাইল দেও। বজলু কাঁচামরিচ দিয়া ডলা দে।

ষ্টেশনে ফিরে জয়নাল ভয়াবহ সংবাদ পেল। পুলিশ পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গেছে– তার মধ্যে একজন হচ্ছে মানববাবু। কি সর্বনাশের কথা। পুলিশ বাপেরকেও খুঁজছে। বাপের পলাতক। পুলিশের এসপি এসেছেন ময়মনসিংহ থেকে। জেলা পুলিশের বড় কর্তা। এদের দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে তিনি বসে আছেন। জয়নাল এক ফাঁকে জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে এল। দেখতে ভদ্রলোকের মত — চুক চুক করে চা খাচ্ছেন।

জয়নাল বজলুকে উঁচু করে দেখাল। ছোটমানুষ দেখতে না পেলে মনে একটা আফসোস থাকতে পারে। একজন কনস্টেবল ছুটে এসে বলল, ভীড় করবেন না কর্মচারী। জানালার কাছ থেকে সরতে মন চাচ্ছে না। এস পি সাহেব এখন কি সুন্দর রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছছেন। এই দৃশ্য দেখার ভাগ্য কয়জনের হয়।

ষ্টেশনে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে হচ্ছে না। জয়নাল বজলুকে নিয়ে ঘুমটি ঘরের দিকে রওনা হল– রমজান ভাইয়ের কাছে যাওয়া যাক। মনটা ভাল নেই। মানববাবুকে ধরে নিয়ে গেছে। মারধর করেছে কিনা কে জানে। ভদ্রলোক পুলিশ নিশ্চয়ই মারধর করে না। কিন্তু কে জানে হয়ত করে। পুলিশ হচ্ছে পুলিশ। এদের কি আর মানুষ পশু আছে?

রমজান ঘরেই ছিল। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। দরজায় জয়নালের ছায়া দেখেই আঁৎকে উঠে বলল, কে কে?

আমি, রমজান ভাই, আমি।

ষ্টেশনের খবর কি-রে জয়নাল?

গাড়ে সব্বনাল রমজান ভাই। ভাল ভাল লোক ধরে বইরা নিয়া যাইতাছে। মানববাবুরে ধরছে।

এই খবর জানি। নতুন কি খবর?

এস পি সাব আইছেন। চা খাইতে খাইতে রুমাল দিয়া ঠোঁট মুছতাছেন। চেহারা সুরত সুন্দর।

বড় চিন্তায় বিষণ্ণ হল জয়নাল।

রমজানের ঠোঁটমুখ শুকিয়ে গেল। আর এত চিন্তার কি আছে জয়নাল বুঝতে পারল না।

সিগেট খাইবেন রমজান ভাই?

দে দেহি।

এই প্রথম রমজান কোনরকম আপত্তি ছাড়াই সিগারেট নিল। চিন্তিত মুখে সিগারেট টানতে লাগল। একবারও বলল না, নিজের পয়সায় জিনিষ ছাড়া খাই না-এ জয়নাল।

জয়নাল কাছে আয় তোরে কানে কানে একটা কথা কই।

জয়নাল এগিয়ে গেল। রমজান ফিস ফিস করে বলল, আমি সব জানিরে জয়নাল। সব জানি।

কি জানেন?

ওয়াগন কে লুট করেছে এই বিত্তান্ত। একজন খুনও হইছে। পুলিশ জানছে গত কাইল — আমি জানি দুই দিন আগে।

হন কি?

জানলে তো লাভ নাই। কারে বলব এইসব কথা? পুলিশেরে বললে পুলিশ সবের আগে ধরব আমারে।

খাঁটি কথা।

রমজান দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে করুণ গলায় বলল, চিন্তা ভাবনা অখন কিছুই করতে পারি না। তুই অত বড় একটা সমস্যা দিলি — মানুষ জাতির লেজ নাই কেন? এই সমস্যা নিয়াও বসতে পারতেছি না। চিন্তা করতে বসলেই সব আওলাইয়া যায়।

থাউক পরে চিন্তা করবেন।

একটা জন্তু অবশ্যি পাইছি যার লেজ নাই — যেমন ব্যাঙ।

ছোট অবস্থায় থাকে বড় অবস্থায় থাকে না। চিন্তা কইরা দেখলাম ব্যাঙের সাথে মানুষের মিলও আছে — ব্যাঙ যেমন বেহুদা লাফায়, মানুষও লাফায়। ব্যাঙ যেমন বড় বড় ডাক ছাড়ে মানুষও ডাক ছাড়ে। আরো চিন্তা দরকার। এখন তুই যা। মাথা আওলা হইয়া আছে।

জয়নাল চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, রমজান আবার ডাকল, খুনটা কে করছে খুঁইজ্যা যা। কাছে আয় — এইসব কথা কানে কানে বলা লাগে।

জয়নাল এগিয়ে এল।

খুনটা করছে হাশেম। একবার মানুষ মারলে আরেকবার মারা লাগে। মাইনষের রক্তের মধ্যে 'নিশা'র জিনিষ আছে। একবার রক্ত দেখলে জবর নিশা হয় — তখন আরেকবার দেখতে মন চায়। তারপর আবার তারপর আবার। প্রথম খুন হইল কে? — মুন্সীরক। হেই খুন আমার নিজের চউকে দেখা। কাউরে কিছু বলি নাই। বলাবলি কইয়া কি লাভ। শুধু নিজের মনে চিন্তা করছি। এখন বললাম তোরে। একজন কাউরে বলতে হয়। না বললে মাথা ঠিক থাকে না। তোরে যে বললাম অহন মাথা ঠিক হইছে। তোর মাথাডা বেঠিক হইল। করণের কিছু নাই। যা আমার কথা শেষ। অহন নিশ্চিন্ত মনে একসিডেন বাজায়ে দিমু।

একসিডেন বাজাইবেন?

হুঁ। আইজ রাইতেই ঘটনা ঘটব। দেরী কইরা লাভ নাই। পুলিশের এস পি সাব যখন আছে সুবিধাই হইল – উনার চউক্ষের সামনে ঘটনা ঘটব। হি– হি– হি।

জয়নাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রমজান আলির মাথা মনে হচ্ছে পুরোপুরিই খারাপ হয়ে গেছে।

ঘটনা আইজ রাইত ঘটব রে রমজান। আইজ আবার পূর্ণিমা পড়ছে। দুইয়ে দুইয়ে চারির।

আপনের মাথা পুরোপুরি গেছে রমজান ভাই।

আমার একলার তো যায় নাইরে রমজান। মাথা সকলের একসাথ গেছে। মাথা কারো ঠিক নাই। হি– হি– হি।

রেল লাইনের স্লীপারের পা রেখে দ্রুত স্টেশনের দিকে ফিরছে জয়নাল। পেছনে পেছনে রজনু আসছে। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। সেই কুয়াশা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। কুয়াশা ভেদ করে সিগন্যালের লাল আলো চোখে আসে। যেন এক চোখওয়ালা কিছু কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কোন বিশেষ ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে সবাই। কি সেই ঘটনা কে জানে।

কে যায়? জয়নাল ভাই না?

জয়নাল থমকে দাঁড়াল। অন্ধকার ফুঁড়ে কে যেন বের হয়ে আসছে — হাশেম। লাইনের উপর ঘাপটি মেরে বসেছিল। তার জন্যই কি বসেছিল। জয়নাল হতমত খেয়ে বলল, কে হাশেম ভাই? শইল ভাল?

হুঁ। শইল ভাল। আপনের কাছে সিগ্রেট আছে জয়নাল ভাই? শীত পড়ছে জবর।

জয়নাল সিগ্রেট দিল। তার হাত কাঁপছিল। সেই কাঁপা হাতেই সে দিয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিতে গেল তখন চোখে পড়ল হাশেমের হাতে একটা লোহার রড যার মাথাটা ছুঁচলো। জয়নালের গা দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

গায়ে নতুন শার্ট দেখতাছি জয়নাল ভাই।

পঁচিশ টেহা দিয়া কিনলাম। একজন বখশিশ দিছিল। তার বাচ্চার জন্য গরম পানি আইন্যা দিলাম। হেই কারণে বখশীশ।

হাশেম সহজ গলায় বলল, ব্যাবসার টেহা মানের জিনিশ। আড়াইশ টেকায় কেনেন। দরদামে কত লাগে। দুনিয়া ভর্তি ঠগ।

এই প্রচণ্ড শীতে, অথচ ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। সে অসহায়ভাবে একবার তাকাল রজনুর দিকে। রজনু একদৃষ্টিতে লোহার রডের দিকে তাকিয়ে আছে।

হাশেম সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, জয়নাল ভাই যা করছেন করছেন এইটা আমি ধরি না — রমজান আপনেরে কি বলল ঠিকঠাক কন।

কিছু বলে নাই।

কিছুই বলে নাই? আমিতো জানি যেই তার কাছে যাইতাছে তারেই সে কানে কানে কথা বলতেছে আমি নাকি খুন করছি। সে না-কি দেখেছে।

পাগল মানুষ ইনার কথা ঠিক না।

পাগল কে কইল? অতি চালাক। আরেকটা কথা কই জয়নাল ভাই। আপনে লোকটাও চালাক।

জয়নাল হাসার চেষ্টা করল। হাসলে পরিস্থিতি খানিকটা হালকা হতে পারে। হাসি এল না। কাশির মত একটা শব্দ হল। সেই শব্দে সে নিজেই চমকে উঠল।

জয়নাল ভাই?

জ্বি।

এতক্ষণ রমজানের লগে ছিলেন — কোন কথাবার্ত হইল না?

উনারে একটা সমস্যা দিছিলাম হেই সমস্যা নিয়া আলাপ করলাম।

কি সমস্যা?

সবজন্তুর লেজ আছে। মানুষের নাই — এইটা নিয়া একটা আলাপ। বাঘ, ভালুক, সিংহ, তারপর ধরেন গিয়া টিকটিকি সবের লেজ আছে। খালি ব্যাঙ-এর নাই। এই জন্যই ব্যাঙের সাথে মানুষের বেজায় মিল। ব্যাঙ খামাখা লাফালাফি করে — বড় বড় ডাক ছাড়ে — মানুষও এই রকম।

হাশেম ঠাণ্ডা গলায় বলল, জয়নাল ভাই আপনে লোকটা বেজায় চালাক।

আপনেও চালাক।

তাও ঠিক — তয় জয়নাল ভাই শুধু চালাকিতে কাম হয় না। শক্তি লাগে। যান ইষ্টিশনে যান। ইষ্টিশনে গিয়া আরাম কইরা ঘুমান, আপনের খুব দরকার।

জয়নাল নড়ে না। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

লোহার রড হাতে ঘুমটি ঘরের দিকে এগিয়ে যায় হাশেম। জয়নাল কি করবে? চিৎকার করে লোক জড় করবে? না-কি ইষ্টিশনে গিয়ে শুয়ে পড়বে? আল্লাহ্ পাক তাঁর ইচ্ছামত দুনিয়া চালান — কোন কিছু করে সেই ইচ্ছাকে বাধা দেয়া কি ঠিক? কি করবে সে? ষ্টেশনে গিয়ে এস পি সাহেবকে কি বলবে — জনাব আপনেরে একটা কথা বলতে চাই। গোপন কথা। এস পি সাহেব কি শুনবেন তার কথা? সে কে? সে কেউ না। ইষ্টিশনে পড়ে থাকা একজন পঙ্গু মানুষ।

রেল লাইনের স্লীপারে পা দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে জয়নাল । তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে বজলু। বজলুর বগলে ভাঁজ করা কম্বল। যে কম্বল তাকে দিয়েছিলেন মালবাবু। বড় ভাল লোক ছিলেন।

ট্রেন আসছে। ঝিক ঝিক শব্দ হচ্ছে। লাইনে তার কাঁপন বোঝা যায়। চিটাগাং মেইল। গৌরীপুর—ময়মনসিংহ হয়ে এই ট্রেন যায় বাহাদুরাবাদঘাট পর্যন্ত। এই ট্রেন প্রতিরাতেই আসে। ট্রেনের শব্দ মিশে আছে তার রক্তে। এটি এমন নতুন কিছু নয়। সকাল থেকেই জয়নালের মনে হচ্ছে আজকের দিনটি অন্যরকম।

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ট্রেনের শব্দে জয়নাল ভেতর থেকে চমকে উঠল। তার হঠাৎ করে কান্না পেয়ে গেল। অনেকদিন সে কাঁদে না। আজ তার কাঁদতে ইচ্ছা করছে। বাপজানের কথা, শাহেদার কথা এবং অনুফার কথা ভেবে একটু চোখের পানি ফেললে কেমন হয় ?

জয়নালের চোখে পানি এসে যায়।

বজলু নীচু স্বরে বলে, আপনে কানতেছেন ?

জয়নাল সার্টের হাতায় চোখ মুছে গাঢ় স্বরে বলল, না কান্দি না। কান্দনের কি আছে? কান্দনের কিছুই নাই। বাপজান যেদিন মরল সেই দিনও কান্দি নাই অরে অইজ কান্দব?

কিন্তু জয়নাল কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ভেজা চোখে তাকিয়ে থাকে ইষ্টিশনের দিকে। মরবার সময় এই ইষ্টিশনের হাতেই তার বাপজান তাকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন।

জয়নাল হাঁটতে শুরু করে।

এত কাছে গৌরীপুর জংশন, তবু মনে হয় অনেক দূর। যেন এই জীবনে সে সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

জয়নালকে ঘিরে একদল পতঙ্গ ওড়াউড়ি করে।

মানুষ যেমন এদের বুঝতে পারে না, এরাও হয়ত মানুষকে বুঝতে পারে না। কে জানে মানুষকে দেখে পতঙ্গরাও বিস্ময় অনুভব করে কি না?

// //